প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষিদের জন্য পুকুর পাড়ে প্রশিক্ষণ কোর্স

(মেয়াদঃ ১দিন)

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রকল্প (এনএটিপি-২)

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর অংগ

মাছচাষ প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষিদের জন্য পুকুর পাড়ে প্রশিক্ষণ কোর্স

(মেয়াদঃ ১দিন)

বিষয়						
দিন	০৯:৩০-১০:০০	১০:০০-১১:০০	চা বিরতি	১১.১৫-১২.১৫	চা বিরতি	১২:৩০-১৩:৩০
১	নিবন্ধন ও কোর্স উদ্বোধন	• কোর্স পরিচিতি, • প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, এবং • মাছচাষের মৌলিক বিষয়াদি (উত্তম মাছচাষ অনুশীলনে করণীয় ও বর্জনীয় এবং পুকুর রেকর্ড বই ব্যবহারসহ)		• মাছচাষ প্রযুক্তিগ্রহণ: প্রকল্পে গৃহীত প্রধান মাছচাষ প্রযুক্তিসমূহ		• মৎস্য আহোরণোত্তর পরিচর্যায় বরফের ব্যবহার • মাছের রোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা • প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা যাচাই, এবং সমাপনী

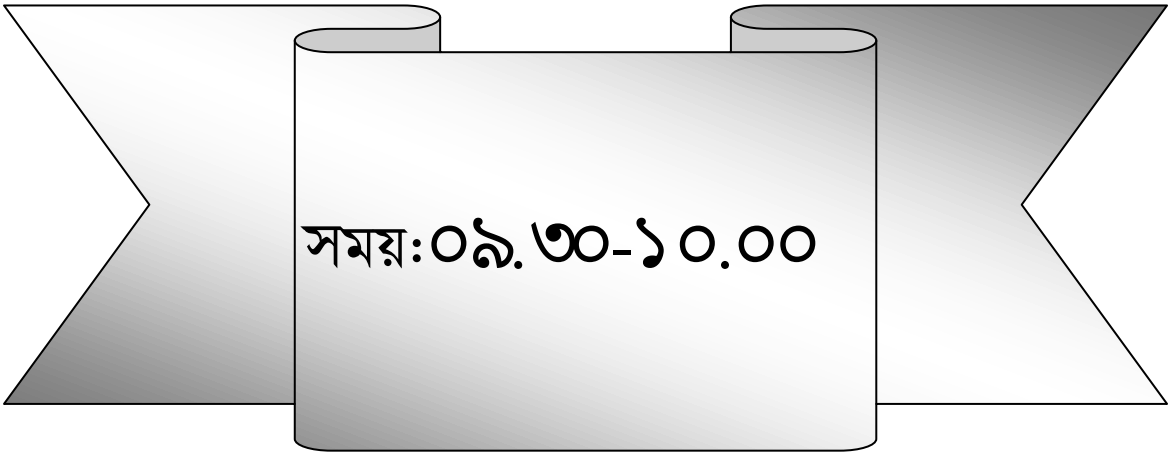

➢ নিবন্ধন, কোর্স উদ্বোধন

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	সময়: ০৯:৩০-১০:০০	**মেয়াদকাল:** ৩০ মিনিট

শিরোনাম: নিবন্ধন ও কোর্স উদ্বোধন

অভীষ্ট দল: মাছচাষ-**প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষি**

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধন ও আনুষ্ঠানিকভাবে মাছচাষ প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা যাতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে পরিচিতি ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

উদ্দেশ্য *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- প্রশিক্ষণার্থীদের সুনির্দিষ্ট ফরমে নাম নিবন্ধন করবেন।
- প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটবে।
- আমন্ত্রিত অতিথিগণ কোর্স সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের নামে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে।

বিষয়সূচি	**আলোচ্য বিষয়**	**প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**	**সময়**
ভূমিকা			৪ মিনিট
	• স্বাগত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			২৩ মিনিট
	• প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ • সুনির্দিষ্ট ফর্মে প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন • প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য প্রদান • প্রধান অতিথি কর্তৃক কোর্স উদ্বোধন	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			৩ মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ইত্যাদি।			

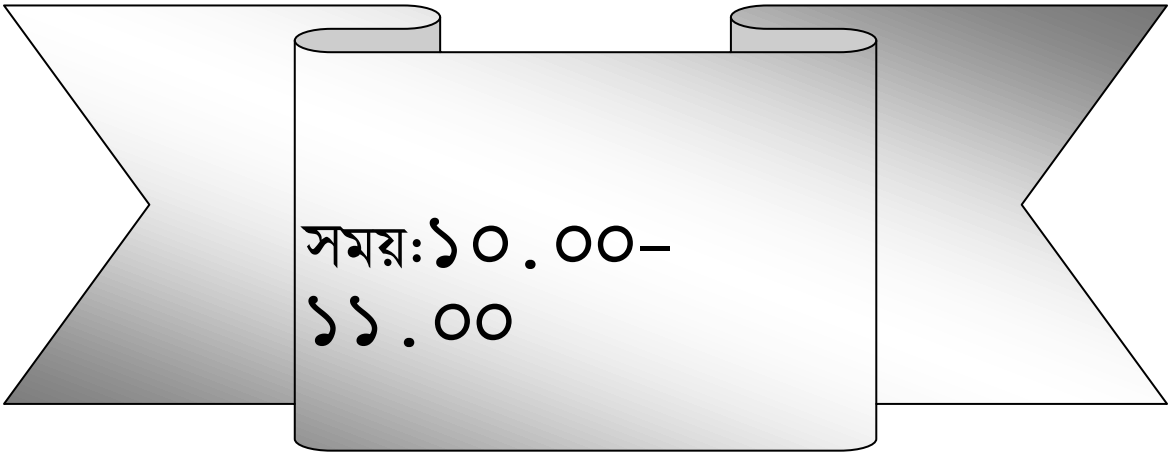

- কোর্স পরিচিতি,
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, এবং
- মাছচাষের মৌলিক বিষয়াদি (উত্তম মাছচাষ অনুশীলনে করণীয় ও বর্জনীয়, এবং পুকুর রেকর্ড বই ব্যবহারসহ)

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	সময়: ১০:০০-১১:০০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: কোর্স পরিচিতি, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা এবং মাছচাষের মৌলিক বিষয়াদি (উত্তম মাছচাষ অনুশীলনে করণীয় ও বর্জনীয়, এবং পুকুর রেকর্ড বই ব্যবহারসহ)

অভীষ্ট দল: মাছচাষ **প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষি**

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচয় ঘটানো এবং কোর্সের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা যাতে তারা কোর্স সম্পর্কে জানতে পারে।

উদ্দেশ্য *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা সম্পর্কে জানাতে পারবেন।
- (উত্তম মাছচাষ অনুশীলনে করণীয় ও বর্জনীয় এবং পুকুর রেকর্ড বই ব্যবহারসহ মাছচাষের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• পরিচিতি পর্ব • সময়সূচি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ • প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা • মাছচাষের মৌলিক বিষয়াদি - বিভিন্ন মাছের পুষ্টিমানের বিবরণ - জলজ পরিবেশের গুণাগুণ - মাটি ও **পানির গুণাগুণ** - আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য - উত্তম মাছচাষ অনুশীলন - পুকুর রেকর্ড বই ব্যবহার	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা ও ধন্যবাদ	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, পুকুর রেকর্ড বই, হ্যান্ডআউট, ভিপকার্ড, ইত্যাদি।			

কোর্সের বিষয়সূচি

দিন	ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
		প্রশিক্ষণ সময়সূচি	০১
১	১.১	নিবন্ধন, কোর্স উদ্বোধন	০২
	১.২	• কোর্স পরিচিতি, • প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা , এবং • মাছচাষের মৌলিক বিষয়াদি (উত্তম মাছচাষ অনুশীলনে করণীয় ও বর্জনীয় এবং পুকুর রেকর্ড বই ব্যবহারসহ)	০৪
	১.৩	কোর্সের বিষয়সূচি	০৬
	১.৪	• মাছচাষ প্রযুক্তি গ্রহণ: প্রকল্পে গৃহীত প্রধান মাছচাষ প্রযুক্তিসমূহ	২২
	১.৫	• মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যায় বরফের ব্যবহার • মাছের রোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা • প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা যাচাই, এবং সমাপনী	৭৭

মাছচাষের মৌলিক বিষয়াদি

ভূমিকা: মাছ বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজ পণ্য। দেশের জনগোষ্ঠির প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ। আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রধান হাতিয়ার মৎস্যচাষ। এজন্য দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা মৎস্যচাষ ও মৎস্য কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংখ্যা কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদির চাহিদা উলে-খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। চাহিদা বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণগুলো হলো: কাংখিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন। মাছ আমরা পাই দু'ভাবে- (১) আহরণ করে (capture fishery) এবং (২) চাষাবাদের সুবাদে (culture fishery)। বিশ্বে প্রথমোক্তটি অর্থাৎ কেবল আহরণ করা মাছের উৎপাদন পরিমাণ স্থির, এমনকি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের বিগত ৪ দশকের পরিসংখ্যান সুস্পষ্টভাবে এটি তুলে ধরেছে যে এদেশে মোট জাতীয় মৎস্য উৎপাদনে capture fishery এর অবদান ক্রমশ: কমে আসছে। বিশ্বে অনেক দেশেই capture fishery ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield) এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বা খুব শীঘ্রই পৌঁছাতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ক্রমবর্ধমান মৎস্যচাহিদা পূরণে culture fishery ক্রমশই: জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং রেখে চলেছে যার ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মৎস্যচাষ কার্যক্রম কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করে ফলে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাদের আয় বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় অভিমত এই যে, বর্তমানে প্রাপ্য সম্পদ ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই মৎস্যচাষ হতে উৎপাদন আরও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও বাজার চাহিদা পূরণের জন্য বাণিজ্যিক মৎস্যচাষে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।

মাছের পুষ্টিমান: স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছ অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রাণিজ আমিষ উচ্চ মানসম্পন্ন এবং এই আমিষই মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত দেহের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শরীর ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধিসহ শিশুদের মস্তিস্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ সাধনে প্রাণিজ আমিষের অবদান অনস্বীকার্য। শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণসহ গর্ভাবস্থায় প্রসূতির অপুষ্টি পূরণেও আমিষ জাতীয় খাদ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাণিজ আমিষের মধ্যে মৎস্য আমিষই উত্তম। এ আমিষ সহজপ্রাচ্য এবং মাছের হাড় ও কাঁটা নরম ও সরু হওয়ায় সহজেই হজম হয়ে শরীর গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সহায়তা করে। এছাড়া মাছের অন্যান্য পুষ্টিগত উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা ও ভিটামিন-এ। এগুলো মানবদেহের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ও গঠনমূলক কাজে লাগে। সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তের কোলেস্টেরল কমায়, ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। নিচের সারণীতে বিভিন্ন মাছের পুষ্টিমানের একটি বিবরণ দেয়া হলো। (প্রতি ১০০ গ্রাম)

প্রজাতি	আমিষ (গ্রাম)	স্নেহ (গ্রাম)	লোহা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ফসফরাস (গ্রাম)	পানি (গ্রাম)
ইলিশ	২১.৮	১৯.৪	০.২১	০.১৮	০.২৮	৫৩.৭
রুই	১৬.৬	১.৪	০.০৮৫	০.৬৮	০.১৫	৭৬.৭
কাতলা	১৯.৫	২.৪	০.৭৬	০.৫১	০.২১	৭৩.৭
মৃগেল	১৯.৫	০.৮	০.৯	০.৩৫	০.২৮	৭৫.০
কালবাউশ	১৪.৭	১.০	০.৩৩	০.৩২	০.৩৮	৮১.০
পাঙ্গাশ	১৪.২	১০.৮	০.০০০৫২	০.১৮	০.১৩	৭২.৩

বোয়াল	১৫.৪	২.৭	০.৬২	০.১৬	০.৪৯	৭৩.০
আইড়	১৫.৯	১.৩	০.৩৯	০.৩৮	০.১৮	৭৮.১
চিতল	১৮.৬	২.৩২	২.৯৮	০.১৮	০.২৫	৭৫.০
ফলি	১৯.৮	১.০	০.১৬	০.৫৯	০.৪৫	৭৩.৩
সরপুঁটি	১৫.৫	৯.৫	০.৫৪	০.২২	০.১২	৭০.২
শিং	২২.৮	০.৬	০.২৬	০.৬৭	০.৬৫	৬৮.০
মাগুর	১৫.০	১.০	০.৭১	০.২১	০.১৯	৭৮.২
কই	১৪.৮	৮.৮	১.৩৫	০.৪১	০.৩৯	৭০.০
ট্যাংরা	১৯.২	৬.৫	০.৩	০.২৭	০.১৭	৭২.৬
পাবদা	১৯.২	২.১	১.৩	০.৩১	০.২১	৭২.০
পুঁটি	১৮.১	২.৪	০.৯৬	০.৯১	০.৯৫	৭৫.০
মলা	১৮.০	৪.১	০.৪	০.৫৫	০.৩৫	-

মাছচাষ বর্তমানে শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক চাহিদা পূরণের জন্য করা হয় না বরং এটি এখন একটি লাভজনক কৃষিকাজ বা ব্যবসা তথা বাণিজ্যিক কার্যক্রম। বাণিজ্যিক মৎস্যচাষের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। মৎস্যচাষে সফলতার জন্য প্রয়োজন উন্নত লাগসই প্রযুক্তি, মানসম্পন্ন উৎপাদন উপকরণ এবং যথোপযুক্ত বাজার ব্যবস্থা। সামাজিক স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ পদ্ধতির ব্যবস্থাপনাকে তিনটি আন্তঃসম্পর্কীয় বিষয়ের সমন্বিত প্রয়োগ হিসেবেই দেখা হয়। বিষয় তিনটি হলো:

১. মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ২. সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিবেচ্য বিষয়াদি ও ৩. পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়াদি

উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক যত নিবিড় ও কার্যকর হবে বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ কার্যক্রম ততই সফলতা পাবে। মাছ এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য জলজ বিষয়াদির চাষের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে পানির গুণাগুণের ওপর অর্থাৎ জলজ পরিবেশের ওপর। অন্য দিকে পানির গুণাগুণ প্রধানত নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার পরিবেশের ওপর। জলজ পরিবেশের গুণাগুণ নির্ভর করে নিম্নোক্ত ৪টি বিষয়ের ওপর:

১. ভৌত উপাদানসমূহ, ২. রাসায়নিক উপাদানসমূহ, ৩. জৈব উপাদানসমূহ, এবং ৪. আবহাওয়াগত উপাদানসমূহ

মাছচাষে আমরা এসব উপাদানসমূহের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পাই। প্রয়োজনমত প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পানির গুণাগুণকে মাছের উৎপাদনে সহায়ক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারার ওপর পানির উৎপাদনশীলতা নির্ভরশীল। উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল পুকুরের মধ্যে পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নের সারণিতে (সারণি-৩) বর্ণনা করা হলো:

সারণি-৩: উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল পুকুরের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যাবলি

উৎপাদনশীল পুকুর	**অনুৎপাদনশীল পুকুর**
১. পুকুরের তলদেশের মাটি দোঁআশ; ২. খুব বেশী গভীর নয় যার ঢাল ক্রমশ: নেমে এসেছে (২:১ এটেল কর্দমাক্ত মাটির জন্য; ৩:১ দোঁআশ বা বালিময় মাটির	১. পুকুরের তলদেশের মাটি বালিময় অথবা খুবই এটেল; ২. খাড়া পাড়যুক্ত গভীর পুকুর; ৩. পানির কেবল একাংশ উৎপাদশীল;

জন্য); ৩. পুকুরের সম্পূর্ণ বা প্রায় সব পানি উৎপাদনশীল; ৪. পানির পি-এইচ ৭.৫ - ৮.৫;	৪. পানি অম্লীয় পিইচ ৬.৫ এর কম অতিক্ষারীয় পি এইচ ৮.৫ এর বেশী সর পরিমাণ কম;
৫. দ্রবীভূত অক্সিজেন ৫ পিপিএম বা তার বেশী; ৬. পানির স্বচ্ছতা ৪০ সে.মি. অথবা তার চেয়ে কম (মূলত প্লাংক্টনের কারণে ঘোলাত্ব); ৭. পানির গভীরতা হ্রাসের বার্ষিক হার ১ মিটারের কম; ৮. প্রয়োজনে পানি সরবরাহের নিশ্চিত ও স্থায়ী ব্যবস্থা আছে; ৯. পানিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যেমন নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের পরিমাণ বেশী ।	৫. দ্রবীভূত অক্সিজেন ৫ পিপিএম এর কম; ৬. একই কারণে পানির স্বচ্ছতা ৪০ সে.মি. এর বেশী; ৭. এই হার ১ মিটারের বেশী; ৮. এই ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই; ৯. নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের পরিমাণ কম ।

মাছের বাসস্থান হচ্ছে জলাশয় এবং জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে পানি। সুতরাং মাছের সেই বাসস্থান হওয়া চাই স্বাস্থ্যসম্মত। মাছের খাদ্যগ্রহণ, বেঁচে থাকা, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীর একটি অনুকূল মাত্রা রয়েছে। জলজ পরিবেশে এসব গুণাবলীর অনুকূল মাত্রা মাছচাষে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনে সহায়ক ভুমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ মাটি ও পানির গুণাগুণের ওপরই নির্ভর করে মাছের উৎপাদন ভাল হবে কিনা। কোন জলাশয়ের পানি ধারণের আধার হলো মাটি। ভাল মাটিতে যেমন ভাল ফসল হয় ঠিক তেমনি ভাল মাটির পুকুরেও মাছের ভাল উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে মাটির ধরনের ওপর নির্ভর করে। উর্বর মাটিতে খনন করা পুকুরে সাধারণভাবে মাছের উৎপাদনও ভাল হয়। উর্বর মাটি ও পানি মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির অধিক পরিমানে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়। সুতরাং মাছচাষে মাটি ও পানির গুণাগুণের গুরুত্ব অপরিসীম।

পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ যথাযথ মাত্রায় না হলে-

- মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন হবে না;
- মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না;
- বাইরে থেকে দেয়া খাদ্যের অপচয় হবে;
- মাছের উৎপাদন কম হবে; এবং
- মাছ রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে।

পানির গুণাগুণ

পানির গুণাগুণ বলতে মাছের বেঁচে থাকা ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পানির সহনশীল অবস্থাকে বুঝায়। পানিতে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস, যেমন- অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অনায়নিত অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং মিথেন; অজৈব পদার্থসমূহ, যেমন- ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি; দ্রবীভূত জৈব পদার্থ যেমন- এমাইনো এসিড, প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ও টেনিক এসিড; অদ্রবীভূত জৈব পদার্থসমূহ, যথা- ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্লাংকটন; অদ্রবণীয় জৈব পদার্থসমূহ যথা- মাটির কণা ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এগুলো ছাড়াও কিছু ভৌত উপাদান, যেমন- তাপমাত্রা, পানির গভীরতা, আলো, ঘোলাত্ব ইত্যাদি পানির গুণাগুণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। নিচে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণকারী ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. পানির ভৌত গুণাগুণ

পানির ভৌত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পানির ভৌত গুণাগুণগুলো নিম্নরূপ:

বর্ণ

পানির হালকা সবুজ বর্ণ পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। পানিতে নাইট্রেটের পরিমাণ কম হলে পানির বর্ণ হলুদাভ হয়। ফসফরাসের পরিমাণ কমে গেলে পানি কালচে বর্ণ ধারণ করে। ধূসর বর্ণের পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কম থাকে। কোন কোন উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটনের আধিক্যের জন্য পানির বর্ণ মরচে লাল হয়, কিন্তু এগুলো মাছের খাদ্য নয়। নিচের সারণিতে পানির বর্ণের ওপর ভিত্তি করে মাছ চাষের উপযোগিতার ধারণা প্রদান করা হলো।

সারণি-১: পানির বর্ণের ওপর ভিত্তি করে মাছ চাষে জলাশয়ের উপযোগিতার ধরন

পানির বর্ণ	প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি	মাছচাষে উপযোগিতা
স্বচ্ছ	উদ্ভিদ-প্লাংকটন নাই	ভাল নয়
সবুজাভ	পরিমাণমত উদ্ভিদ-প্লাংকটন আছে	ভাল
ঘন সবুজ	অতিরিক্ত উদ্ভিদ-প্লাংকটন আছে	ক্ষতিকর
বাদামী সবুজ	পরিমাণমত উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্লাংকটন আছে	উত্তম
ধূসর সবুজ	অল্প উদ্ভিদ-প্লাংকটন ও ভাসমান পলিকণা বিদ্যমান	কম উপযোগী
মরচে লাল	মাছের খাদ্য নয় এমন উদ্ভিদ-প্লাংকটন বিদ্যমান	উপযোগী নয়

গভীরতা

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাংকটনের উৎপাদন ও সালোকসংশ্লেষণের জন্য সূর্যালোক অপরিহার্য। পুকুর বেশি গভীর হলে সূর্যালোক নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, এতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় না, ফলে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পুকুরের গভীরতা কম হলে পানি গরম হতে পারে এবং তলদেশে ক্ষতিকর উদ্ভিদ জন্মাতে পারে। পানির গভীরতা বেশি হলে পুকুরের তলদেশে তাপমাত্রা কম থাকে, অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় দূষণ এড়াতে তলদেশের মাছ ও অন্যান্য প্রাণী পানির উপরিভাগে চলে আসে।

স্বচ্ছতা ও ঘোলাত্ব:

পুকুরের পানি ঘোলা হলে কার্যকর সূর্যালোক পানির নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ উদ্ভিদ-প্লাংকটনের উৎপাদন কমে যায়। আবার পানির উপরের স্তরে অতিরিক্ত উদ্ভিদ-প্লাংকটন উৎপাদনের ফলেও পানির স্বচ্ছতা কমে যেতে পারে। এতে অক্সিজেনের অভাবে মাছের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। পানির স্বচ্ছতা ২৫ সেন্টিমিটার হলে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয়। ঘোলা পানি মাছের খাদ্য চাহিদাকে প্রভাবিত করে। ঘোলা পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন ধরনের কণা মাছের ফুলকায় আটকে থেকে ফুলকা বন্ধ করে দেয়। এতে মাছের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ফলে মাছের খাদ্য চাহিদা হ্রাস পায়।

১. প্রতি শতকে ১.০-১.৫ কেজি হারে জিপসাম প্রয়োগ করে পানির ঘোলাত্ব দূর করা যায়।

২. পুকুরের কোণায় খড়ের ছোট ছোট আটি রেখে দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

তাপমাত্রা

মাছ শীতল রক্তবিশিষ্ট জলজ প্রাণী। মাছের শরীরের তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে। তাই মাছের বৃদ্ধি হার তাপমাত্রার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। গ্রহণযোগ্য সীমার (Optimum) মধ্যে তাপমাত্রা বাড়লে মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতাও বেড়ে যায়। যথাযথ তাপমাত্রায় অধিক খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে হজম ক্রিয়া ও নিঃসরণে কম সময় লাগে। ফলে অধিক পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্যয় হয় কম পরিমাণ। ফলে মাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়। তবে তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেনের

মাত্রা কমতে থাকে। এতে মাছের খাদ্য গ্রহণের হার হ্রাস পায় এবং মাছ মারা যেতে পারে। আবার তাপমাত্রা কমে গেলে মাছের খাদ্য গ্রহণের হার কমে যায়। এজন্য শীতকালে পুকুরে সার ও খাদ্যের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়। তাপমাত্রা খুব বেশি কমে গেলে মাছ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। প্রসঙ্গত উলেখ্য, অগভীর (<১.১৫মি.) ছোট পুকুরে (<১০শতাংশ) তাপমাত্রা খুব দ্রুত উঠানামা করে থাকে।

রুইজাতীয় মাছ চাষের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা ২৫-৩০ ডিগ্রী সে.। কোন কারণে পুকুরে পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাইরে থেকে পরিষ্কার ঠান্ডা পানি সরবরাহ করা যেতে পারে। টোপাপানা দ্বারাও পুকুরের পানির ১০ ভাগ আয়তনে সাময়িকভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করে বেশি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

সূর্যালোক

সূর্যালোকের ওপর পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদশীলতা তথা উদ্ভিদ-প্লাংকটনের উৎপাদন নির্ভর করে। পুকুরের পানিতে আলোর প্রবেশ বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্থ হতে পারে। যথা- পুকুর পাড়ে বড় গাছপালা, পানির ঘোলাত্ব, জলজ আগাছা ইত্যাদি। পুকুর পাড়ে বড় গাছ থাকলে ডালপালা কেটে দিয়ে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরের পানি ঘোলা হলে আলো প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে প্লাংকটনের উৎপাদন উপরিভাগের সামান্য স্তরব্যাপী সীমাবদ্ধ থাকে। বিভিন্ন ধরনের ভাসমান আগাছাও পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে। এগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুরের পানিতে আলো প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হলে উদ্ভিদ-প্লাংকটনের উৎপাদন কম হয়। ফলে মাছের উৎপাদনও কমে যায়।

২. পানির রাসায়নিক গুণাগুণ

পানির রাসায়নিক গুণাবলী জলজ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাসায়নিক গুণাবলী পরীক্ষা করে পুকুরের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। নিচে পানির বিভিন্ন রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

দ্রবীভূত অক্সিজেন

অক্সিজেন জীবনের জন্য অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন ছাড়া কোন প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্ভব নয়। সে কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে চিংড়ির অক্সিজেন চাহিদা কার্পের চেয়ে বেশি। কৈ, শিং মাগুর মাছের অক্সিজেন চাহিদা তুলনামূলক কম।

উদ্ভিদ-প্লাংকটন ও জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন প্রস্তুত করে তা পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাতাস থেকে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন সরাসরি পানিতে মিশে। পুকুরের মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এ অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। রাতে সূর্যালোকের অভাবে পানিতে কোন অক্সিজেন প্রস্তুত হয় না। পুকুরের তলায় জৈব পদার্থ পচনেও অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। এজন্য সকালে পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কমে যায়, বিকেলে অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। পানিতে ২.০ মি.গ্রা/লিটারের (২ পিপিএম) কম অক্সিজেন থাকলে রুইজাতীয় মাছ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। পুকুরের পানিতে ৫-৮ মি.গ্রা/লিটার (পিপিএম) হারে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকলে মাছ কাঙ্ক্ষিত হারে বৃদ্ধি পায়।

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস দু'টি-

ক. পানি সংলগ্ন বাতাস

খ. সবুজ শেওলা ও ডুবন্ত জলজ-জীবের সালোকসংশ্লে- ষণ দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা পানির নিম্নোক্ত গুণাবলির ওপর নির্ভর করে :

১. তাপমাত্রা ২. লবণাক্ততা এবং ৩. বায়ুমন্ডলের চাপ

তাপমাত্রার সাথে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রার ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional) সম্পর্ক রয়েছে। তাপমাত্রা বাড়লে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমে এবং তাপমাত্রা কমলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। নিচের সারণিতে বিভিন্ন তাপমাত্রায় পানিতে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা দেখানো হলো:

বিভিন্ন কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ার প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

● পানিতে বসবাসকারী জলজ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস; ● পুকুরের তলায় বিদ্যমান জৈব পদার্থের পচন; ● তলায় অবস্থিত গ্যাসের বুদবুদের সাথে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন চলে যাওয়া; ● আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা; ● ক্ষতিকর ব্লুম ***(bloom)*** সৃষ্টি;	● মাটিতে লৌহের পরিমাণ বেশি থাকা; ● পানিতে গাছের পাতা ও ডালপালা পড়া; ● কাঁচা গোবর বেশি পরিমাণে ব্যবহার; ● পানি খুব ঘোলা হওয়া।

মাছ চাষে অক্সিজেনের প্রভাব

মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য দ্রবীভূত অক্সিজেনের সর্বোত্তম মাত্রা হচ্ছে ৫-৮ মি. গ্রা/লিটার। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে মাছ ও চিংড়ির বৃদ্ধি, খাদ্যের পরিবর্তন হার ও ডিমের সংখ্যাও কমে যায়। অক্সিজেন খাদ্যদ্রব্য হজমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পানিতে পরিমিত মাত্রায় অক্সিজেন থাকলে খাদ্যের পরিবর্তন হার বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্যে অধিক পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয়। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা বাড়লে মাছের খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অক্সিজেনের মাত্রা কমলে খাদ্য চাহিদা হ্রাস পায়। এছাড়াও শ্বাসকষ্টজনিত কারণে ব্যাপকভাবে মাছ ও চিংড়ি মারা যেতে পারে। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ সহনশীল মাত্রার নিচে নেমে গেলে নিম্নরূপ লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়ে থাকে -

- মাছ পানির উপর ভেসে উঠে ও খাবি খায়;
- চিংড়ি পুকুর পাড়ের কাছে চলে আসে;
- মাছ ও চিংড়ি ক্লান্তিহীনভাবে পানিতে ঘোরাফেরা করতে থাকে।

পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হলে, তলায় খুব বেশি জৈব পদার্থ থাকলে, অধিক ঘনত্বে মাছ-চিংড়ি মজুদ করা হলে, বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণ সার ও খাদ্য প্রয়োগ করা হলে উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। সাধারণত: মধ্যরাত থেকে ভোরের দিকে বা মেঘলা দিনে পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়। পুকুরে অক্সিজেন পরিমাপ করার সময় তলদেশের পানিতে কী পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত আছে তা বিবেচনায় আনতে হবে।

সাময়িক অক্সিজেন ঘাটতি মোকাবেলার উপায়

- পানির উপরিভাগে ঢেউ সৃষ্টি করে বা পানি আন্দোলিত করে
- সাঁতার কেটে বা বাঁশ পিটিয়ে বা হাত দিয়ে পানি ছিটিয়ে
- পাম্প দিয়ে নতুন পানি সরবরাহ করে

কার্বন ডাই-অক্সাইড

মাছের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড অপরিহার্য। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার এটি একটি মৌলিক উপাদান। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে না। এরূপ অবস্থায় জলাশয়ের প্রাথমিক উৎপাদন ব্যাহত হয়। পুকুরের তলায় অত্যাধিক জৈব পদার্থ ও কাদা থাকলে অধিক তাপমাত্রায় পুকুরে এ গ্যাসের আধিক্য ঘটে। পানিতে ২ নিযুতাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকলে মাছের উৎপাদন ভাল হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পানিতে তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত হতে পারে। পানিতে এ গ্যাসটি মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, বাইকার্বোনেট এবং কার্বনেট হিসেবে থাকতে পারে। পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মূল উৎস হলো জৈব পদার্থের পচন এবং পানিতে অবস্থিত জলজ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রভাব

পানিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পেলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়। এতে মাছের খাদ্য চাহিদা পূরণ হয় না। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে পানির অম্লত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রাথমিকভাবে প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হলেও মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা ও চাহিদা হ্রাস পায়।

মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড সাধারণভাবে মাছ ও চিংড়ির জন্যে বিষাক্ত নয়। মাছ ও চিংড়ি কিছু সময়ের জন্য ৫০-৬০ মি. গ্রা/লিটার পর্যন্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহ্য করতে পারে। এ গ্যাসের বিষাক্ততা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে। অক্সিজেনের ঘনত্ব বেশি হলে এর বিষাক্ততা কম হয়। পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ১২ মি. গ্রা/লিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়। পানিতে এর পরিমাণ বেশি হলে মাছ ও চিংড়ি শ্বাস কষ্ট হয়ে থাকে।

কার্বন ডাই-অক্সাইউ নিয়ন্ত্রণের উপায়

- মজুদ ঘনত্ব ও সার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং পুকুরের গভীরতা কমিয়ে;
- নিয়মিত হররা টেনে;
- পানিতে ১.০ নিযুতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করলে প্রায় ১.৫ নিযুতাংশ হারে কার্বন-ডাই অক্সাইড কমে যায়।

পিএইচ (pH) ঋণাত্বক হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের পরিমাপকই পিএইচ। পিএইচ সংখ্যামান দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এ পরিমাপক ০ থেকে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। পিএইচ-এর মাধ্যমে পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে ৭ নিরপেক্ষ মান, ৭ এর উপরে (৭-১৪) ক্ষারীয় মান এবং ৭ এর নিচে (৭-০) অম্লীয় মান নির্দেশ করে।
অপেক্ষাকৃত ক্ষারধর্মী পানি (পিএইচ ৬.৫-৯.০) মাছ চাষের জন্য ভাল। পিএইচ মাত্রা ৯.৫ এর বেশি হলে পানিতে মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকতে পারে না। ফলে পানিতে উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটনের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় মাছের উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। পানির পিএইচ ১১.০ হলে বা ৪.০-এর নিচে নামলে মাছ মারা যেতে পারে। পিএইচ ৭.০-৭.৫ এর মধ্যে থাকলে ফসফরাস সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। অম্ল পানিতে উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। পানি অম্ল-হলে পুকুরে চুন দিতে হয়।

পানির পিএইচ মাছের খাদ্য চাহিদার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অম্ল পানি মাছ চাষের জন্য ভাল নয়। এ ধরনের পানিতে মাছের ক্ষুধা হ্রাস পায় ও খাদ্য চাহিদা কমে যায়। ফলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও উৎপাদন হ্রাস পায়। কোন জলাশয়ে পানির পিএইচ ৯.০-এর বেশি হলে এবং তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে মাছের খাদ্য চাহিদা কমে যায় ও বৃদ্ধি শুন্যের কোঠায় দাঁড়ায়। পিএইচ মাত্রা ৭.০ থেকে ৮-৫ এর মধ্যে থাকলে মাছের খাদ্য চাহিদা বেশি থাকে ও উৎপাদন বেশি হয়।

পানির পিএইচ মানের দ্রুত উঠানামা মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য ভাল নয়। পানির পিএইচ মান কমে গেলে মাছ ও চিংড়ির নিম্নবর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে:

- মাছ ও চিংড়ির দেহ থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড বেরিয়ে যায়, ফলে এরা দুর্বল হয়ে মারা যায়;
- মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও খাবার রুচি কমে যায়;
- পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন হ্রাস পায়;
- মাছ ও চিংড়ির প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়;
  অন্যদিকে পানির পিএইচ বেড়ে গেলে মাছ ও চিংড়ির নিম্নবর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে;
- ফুলকা এবং চোখ নষ্ট হয়ে যায়;
- অসমোরেগুলেশন ক্ষমতা হ্রাস পায়;
- খাদ্য গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়।

পানির পিএইচ অনুমান

পানি মুখে দিয়ে টক বা লবণাক্ত স্বাদ লাগলে বুঝা যাবে পিএইচ ৭.০ এর কম; অম্ল- পানিতে লিটমাস কাগজ ভিজালে নীল হবে; পানির পিএইচ ৭.০ এর বেশি হলে পানি মুখে দিলে কষযুক্ত মনে হবে; ক্ষারীয় পানিতে লিটমাস কাগজ ভিজালে লাল হবে।

পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে পিএইচ বাড়ানো যায়। মাছ চাষে পানির আদর্শ পিএইচ মাত্রা হচ্ছে ৭-৯। পিএইচ মান ৪ এর নিচে গেলে মাছ মারা যাবে। বর্ষাকালে সাধারণতঃ পানির পিএইচ যথাযথ মাত্রায় থাকে।

ক্ষারত্ব ও খরতা

পানিতে বিভিন্ন ক্ষার (বাই-কার্বনেট, কার্বনেট)-এর ঘনত্ব হলো ক্ষারত্ব। আর ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মোট ঘনত্ব হচ্ছে খরতা। খরতা ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। মোট খরতা পরিমাণ মোট ক্ষারত্বের সাথে সম্পর্কিত। মাছ ও চিংড়ি চাষে উপযোগী ক্ষারত্ব মাত্রা ৭০-১৬০ মি.গ্রা./লিটার এবং খরতা ২০-১০০ মি.গ্রা./লিটার। পুকুরের পানির মোট ক্ষারত্ব নূন্যতম ৪০.০০ মি.গ্রা./লিটার থাকা বাঞ্ছনীয়। ক্ষারত্ব কম হলে পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টির অভাব দেখা দেয় এবং বৃদ্ধি পেলে পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধি পায় ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ক্ষারত্ব ও খরতার প্রভাব

মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভাল। ক্ষারত্ব ও খরতার কাঙ্ক্ষিত মানের চেয়ে খুব কম বা বেশি হলে:

- পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়, ফলে পিএইচ দ্রুত উঠানামা করে;
- পুকুরে সার দিলে তা আশানুরূপ কার্যকর হয় না;
- চিংড়ি খোলস বদলাতে পারে না;
- ক্ষারত্ব ৩০০ মিগ্রা/লিটারের বেশি হলে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন হ্রাস পায়, কারণ এ অবস্থায় সালোকসংশেষণের জন্যে প্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে না;
- মাছ সহজেই অম্লত্ব ও অন্যান্য ধাতুর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

পুকুরে নিয়মিত চুন অথবা জিপসাম প্রয়োগ করে খরতা ও ক্ষারত্ব কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ফসফরাস

প্রাকৃতিক পানিতে অতি অল্প পরিমাণ ফসফরাস থাকে। এই ফসফরাস ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। পরিমিত ফসফেটের উপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিদ-প্লাংকটন জন্মায়। জলজ উৎপাদনে ফসফরাস এককভাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জৈব পদার্থের আধিক্যই ফসফরাসের সরবরাহ বাড়ায়। পুকুরের পানিতে ০.২ মি.গ্রা./লিটার ফসফরাস থাকা প্রয়োজন।

নাইট্রোজেন

নাইট্রোজেন জলজ উদ্ভিদের মৌলিক পুষ্টি উপাদান। আমিষ সংশ্লেষণের মৌলিক উপকরণ হিসেবে নাইট্রোজেন জলজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতি প্রদত্ত নাইট্রোজেন জলাশয়ের নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। পানিতে ০.২ মি.গ্রা./লিটার নাইট্রোজেন মাত্রা মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

- জিপসাম প্রয়োগ করে পানির মোট ক্ষারত্ব বাড়ানো যায়; এমপি সার প্রয়োগ করে পানিতে ফসফরাসের পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো যায়: ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে পানিতে নাইট্রোজেনের অভাব দূর করা যায়

অ্যামোনিয়া

ইহা একটি নাইট্রোজেনজাত বিষাক্ত গ্যাস। এ গ্যাসের উপস্থিতিতে মাছ ও চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পানিতে অ্যামোনিয়ার বেশি মাত্রার উপস্থিতিতে সমস্ত মাছ ও চিংড়ি মারা যেতে পারে। অ্যামোনিয়া পানিতে দু'ভাবে থাকতে পারে- আয়নিত অ্যামোনিয়া (NH_4^+) ও অনায়নিত অ্যামোনিয়া (NH_3)। অনায়নিত অ্যামোনিয়া আয়নিত অ্যামোনিয়ার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। অনায়নিত অ্যামোনিয়া মাছ ও চিংড়ির জন্যে বিষাক্ত। তাই পানিতে এর মাত্রা ০.০২৫ মি.গ্রা./লিটার এর বেশি হওয়া উচিত নয় এবং ০.১ মিগ্রা/লিটার অতিক্রম করা বিপদজনক।

মাছের বর্জ্য, উচ্ছিষ্ট খাদ্য, বিভিন্ন নাইট্রোজেনজাত পদার্থ, মৃত শ্যাওলা পচনের ফলে পানিতে অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া দূষিত পদার্থের দ্বারা পুকুরের পানিতে অ্যামোনিয়া চলে আসতে পারে। তাপমাত্রা এবং পিএইচ মাত্রা বেশি থাকলে পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়া বেড়ে যায়। সাধারণত: সন্ধ্যার দিকে যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড কম থাকে এবং পিএইচ মাত্রা বেশি থাকে, তখনই পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়া বেড়ে যায়।

পুকুরে অ্যামোনিয়া বাড়লে মাছ ও চিংড়ির রক্ত এবং পেশীতে অ্যামোনিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মাছ ও চিংড়ির দেহের পিএইচের মাত্রা কমে যায় ও বৃদ্ধি হ্রাস পায়। এ অবস্থায় মাছ ও চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয় এবং অস্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে থাকে।

অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব পরিহার করে এবং সার ও খাদ্য প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে অ্যামোনিয়া দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

হাইড্রোজেন সালফাইড

এ গ্যাসের ০.০১-০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার ঘনত্বে জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটতে পারে। পানিতে এ গ্যাসের পরিমাণ ০.০০২ মিলিগ্রাম/লিটার এর বেশি থাকা কোনভাবেই নিরাপদ নয়। পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের উপস্থিতি না থাকাই উত্তম।

লবণাক্ততা

সামান্য লবণাক্ততায় (৩পিপিটি) অধিকাংশ কার্পজাতীয় মাছ ও কৈ, মাগুর, শিং মাছ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বাদু পানিতে কৈ, মাগুর, শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে লবণাক্ততা কোন সমস্যা নয়।

৩. পানির জৈবিক গুণাগুণ

পুকুরের পানিতে স্বাভাবিকভাবে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মায়। কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী অতি ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। আবার কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী পুকুরের পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। ফলে মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটে। নিম্নবর্ণিত জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী পুকুরে জন্মে থাকে।

ভাসমান উদ্ভিদ

এ ধরনের জলজ উদ্ভিদের পাতা পানির উপরে ভাসতে থাকে কিন্তু মূল পানির মধ্যে ঝুলে থাকে। যেমন-কচুরিপানা, টোপা পানা, ক্ষুদে পানা ইত্যাদি। এগুলো পুকুরে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে এবং পুকুরে ব্যবহৃত সার হতে পুষ্টি গ্রহণ করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। পুকুরে এ ধরনের উদ্ভিদ থাকলে সেগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

ডুবন্ত উদ্ভিদ

এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে থাকে। এরা পুকুরের গভীরে সূর্যের আলো প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। যেমন-পাতা ঝাঁঝি, কাঁটা ঝাঁঝি, নাজাস ইত্যাদি।

নির্গমনশীল উদ্ভিদ

কিছু জলজ উদ্ভিদের মূল পুকুরের কিনারায় থাকে এবং উদ্ভিদগুলো পানির উপরে বাড়তে থাকে, এগুলো নির্গমনশীল উদ্ভিদ। যেমন-আড়ালি, দল, কলমিলতা ইত্যাদি।

লতানো উদ্ভিদ

কিছু জলজ উদ্ভিদের মূল পুকুরের পানিতে ভাসমান থাকে এবং উদ্ভিদের শাখা প্রশাখাগুলো পানির উপরে ছড়িয়ে থাকে, এগুলো লতানো উদ্ভিদ। যথা -হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কেশরদাম ইত্যাদি।

প্ল-াংকটন

পানিতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকণা থাকে তাকেই প্লাংকটন বলা হয়। প্লাংকটন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। প্লাংকটন বেশি থাকা পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। প্লাংকটন দু'ধরনের ক) উদ্ভিদ-প্লাংকটন খ) প্রাণী-প্লাংকটন।

উদ্ভিদ-প্ল-াংকটন (Phytoplankton)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদই উদ্ভিদ-প্লাংকটন। এগুলোর বর্ণ সবুজ। উদ্ভিদ-প্লাংকটন মাছের খাদ্য শিকলের প্রথম পর্যায়ের প্রাকৃতিক খাদ্য। যেমন-ডায়াটম, ভলভক্স, স্পাইরোগাইরা ইত্যাদি। এগুলোকে সবুজ শেওলাও বলা হয়। পুকুরে উদ্ভিদ-প্লাংকটন অত্যধিক

জন্মালে পানির উপর ঘন সবুজ স্তর পড়ে। একে ব্লুম বলে। এরূপ অবস্থা মাছের জন্য ক্ষতিকর। ঘন সবুজ স্তর পুকুরের পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাঁধার সৃষ্টি করে। জলাশয়ে পরিমিত উদ্ভিদ-প্লাংকটনের উপস্থিতি সফলভাবে মাছ চাষের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রাণী-প্ল-াংকটন (Zooplankton)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে প্রাণী-প্লাংকটন বলা হয়। প্রাণী-প্লাংকটন সাধারণতঃ বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। যেমন-ডেফনিয়া, রটিফেরা, ময়না ইত্যাদি। প্রাণী-প্লাংকটন মাছের খাদ্য শিকলের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাকৃতিক খাবার।

কীট-পতংগ

পুকুরের তলদেশে বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ বাস করে। এগুলো মাছের খাদ্য চক্রের অন্তর্ভুক্ত। যথা-বিভিন্ন লার্ভি, ওয়াটার বিটল। পানির উলিখিত গুণাবলীসমূহ যথাযথ মাত্রায় সংরক্ষণ করা গেলে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। ফলে অল্প ব্যয়ে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায়।

৪. আবহাওয়াগত উপাদানসমূহ

- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বন্যা প্রবণতা এ তিনটি প্রধান উপাদান মাছ চাষে প্রভাব বিস্তার করে।

মাটির উপাদান: মাটি হলো ভূপৃষ্ঠর উপরিতলের নরম খনিজ এবং জৈব উপাদানের মিশ্রণ, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মাটি প্রধানত ৪টি প্রধান উপাদান সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো নিম্নে উল্লিখিত হলো-

১) খনিজ পদার্থ - ৪৫% ২) জৈব পদার্থ - ৫%
৩) বায়ু - ২৫% ৪) পানি - ২৫%

সুতরাং মাটি কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় - এই তিন ধরনের পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। নিম্নে মাটির বিভিন্ন উপাদানের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

১. খনিজ পদার্থ: ভূ- ত্বক প্রথমে শিলা দ্বারা গঠিত ছিল। পরে তা শিলা ক্ষয় প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট খন্ডে বা এককে রূপান্তরিত হয়। মাটির এই অংশ বালি ও কর্দম কণা দ্বারা গঠিত। শিলা ক্ষয় প্রক্রিয়ার ফলে উপরোক্ত কণা ও অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদান যেমন- নাইট্রোজেন ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান মাটিতে যুক্ত হয়। মাটিতে খনিজের পরিমাণ হলো ৪৫%।

২. জৈব পদার্থ : মাটিতে ১-২% জৈব পদার্থ থাকে তবে হিম অঞ্চলের মাটি ২-৫% জৈব পদার্থ ধারণ করে। এই সব জৈব পদার্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশিষ্টাংশ এবং মলমূত্র হতে মাটিতে আসে। জৈব পদার্থ মাটির আবদ্ধকরণ পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুম কম হলেও এটি ব্যাপকভাবে মাটির গুণাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জৈব পদার্থ নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে-

১. সমস্ত পুষ্টি উপাদানের মজুদ হিসেবে কাজ করে; ২.মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণাবলী উন্নত করে;
৩. ভূমি ক্ষয় রোধ করে; ৪.জলাশয়ের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে;
৫. অণুজীবের প্রধান শক্তি হলো এই জৈব পদাথ এবং ৬. মাটিতে নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস এ জৈব পদার্থ।

মাটির প্রকারভেদ

বালি, পলি ও কাদা - এই তিনটি স্বতন্ত্র মাটি কণার তুলনামূলক অনুপাতের উপর ভিত্তি করে মাটির বুনটসমূহের নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মাটি বিভিন্ন অনুপাতে বালু, পলি ও কাদা কণা ধারণ করে থাকে। কোন মাটিতে বালু কণার পমিাণ বেশি, আবার কোনটাতে কাদা কণার পরিমান বেশি। এই পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট সীমারেখায় রেখে মাটিকে ১২টি গ্রুপ বা দলে বিভক্ত করা হয়, এই দলগুলোই বুনটভিত্তিক শ্রেণী বলে পরিচিত। এই শ্রেণীগুলোর একটি হতে অন্যটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ধর্মে যথেষ্ট পার্থক্য

পরিলক্ষিত হয়। যে মাটিতে অধিক পরিমাণ কাদা কণা (%) ধারণ করে তাকে কাদা মাটি, যে মাটিতে অধিক পরিমাণ পলি কণা (%) ধারণ করে তাকে পলি মাটি, আর যে মাটিতে বালু কণার পরিমান বেশি (%) থাকে তাকে বেলে মাটি বলে। যদি কোন মাটি এই তিন তিনটি শ্রেণীর একটিরও প্রভাব বিস্তারকারী ভৌতিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন না করে (যেমন -৪০ বালু কণা, ২০% কাদা কণা ও ৪০% পলি কণা যুক্ত মাটি) তবে তাকে দো–আঁশ মাটি বলে। দো-আঁশ বালু, পলি ও কাদা কণার শতকরা সমান থাকে না। কিন্তু এটা বালু, পলি ও কাদা কণাসমূহের কাছাকাছি প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম প্রদর্শন করে।

পুকুরের তলানী থেকে পুষ্টিকারক পদার্থসমূহের অবমুক্তি কিংবা ধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে পানির বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ধর্ম এবং তলদেশের কাদা ও পুকুরে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার কর্মকান্ড এর ওপর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভৌত রাসায়নিক প্রভাবকসমূহ যা তলদেশীয় মাটি ও পানির সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া করে থাকে মূলত নির্ভর করে তলদেশীয় মাটির ধরন, তাপমাত্রা, গভীরতা পানির ঘনত্ব, দ্রবীভূত অক্সিজেন পিএইচ এবং মোট ক্ষারত্বের ওপর। তা ছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক আছে, সেগুলো হলো- আবহাওয়া, ঋতু, ওয়াটার শেড, পানি চোয়ানো ইত্যাদি।

আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য

- পুকুর আয়তকার এবং আয়তন ৩০-১০০ শতাংশ বা আরো বড় হতে পারে;
- পানির গভীরতা ১.৫-২.০ মিটার এবং পুকুরের ঢাল ১ঃ২ অনুপাতে হলে ভাল হয়;
- দোঁ-আশ মাটির পুকুর হলে ভলো হয় (এটেল মাটির পুকুরের পানি ঘোলা থাকে, ফলে সূর্যের আলো পানির ভিতরে কম প্রবেশ করতে পারে। প্রাকৃতিক খাদ্য কম হয়। বেলে মাটির পুকুরে পানি ও পুষ্টির অভাব বেশি হয়);
- তলায় কাদার পরিমাণ ১০.০০-১৫.০০ সেঃ মিঃ এর বেশি না হয়;
- পুকুরে দৈনিক সূর্যালোকের মেয়াদ কাল ৬-৮ ঘন্টা থাকতে হবে;
- পাড়ে ছায়া সৃষ্টিকারী কোন গাছ বা ঝোঁপ-ঝাড় থাকবে না;
- বন্যা মুক্ত হতে হবে বা পুকুরের পাড় বাইরের পানি রোধ করার মত যথেষ্ঠ উচু ও শক্ত হতে হবে;
- পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে;
- জরুরী পানি নির্গমণের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- পুকুরে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- পুকুরের তলদেশের পানি সম্পূর্ণ নিষ্কাশনের জন্য পুকুরের তলদেশ একদিকে ঢালু হতে হবে।

মাছ চাষের জন্য উপরোক্ত সকল বৈশিষ্ট্য একটি পুকুরে থাকবে তা নয় তবে মাছ চাষের জন্য পুকুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে, পাশাপাশি নিম্নে উলেখিত সুযোগ সুবিধা পুকুরে থাকলে মাছ চাষে অধিক সফলতা পাওয়া যাবে।

- পুকুরটি একক মালিকানা হলে ভাল হয়। (লিজের পুকুর হলে ন্যূনতম ৫ বছরের জন্য লিজ নিতে হবে);
- পুকুরের সাথে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য পুকুরের অবস্থান বাড়ির কাছাকাছি হলে ভাল হয়;
- পোনার প্রাচুর্য থাকতে হবে।

মাছ চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিকভাবে পুকুর নির্বাচন করা না হলে মাছ চাষে সমস্যা হয়, মাছের ভাল ফলন পাওয়া যায় না, মাছ চুরি হতে পারে, উৎপাদিত মাছ ও পোনা পরিবহনে অসুবিধা হতে পারে এবং পুকুর পরিচর্যায় সমস্যা দেখা দিতে পারে সর্বোপরি মাছ চাষে সফলতা পাওয়া যাবে না।

উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন

১. উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বা গুড অ্যাকোয়াকালচার প্র্যাকটিস (Good Aquaculture Practice-GAqP) কী?

উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন হলো- চাষ, আহরণ ও আহরণোত্তর পর্যায়ে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত নিয়মাবলি অনুসরণ করে দূষণমুক্ত ও নিরাপদ মাছ/চিংড়ি উৎপাদন করা। তবে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং পরিবেশ সহনীয় হতে হবে। সামগ্রিকভাবে খামার পরিকল্পনা, পুকুর তৈরি, পোনার মান, খাদ্য ও পানির গুণাগুণ ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সবই **উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন** এর আওতায় আসে। বাংলাদেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং মাছের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এটি অপরিহার্য।

উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন এর উদ্দেশ্য হলো ঃ

- ভোক্তার জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত মাছ/চিংড়ি উৎপাদন করা ;
- মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন রোগজীবাণু দ্বারা মাছ/চিংড়ি যাতে সংক্রমিত না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
- ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক যেমন- নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল বা কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা কীটনাশক দ্বারা চিংড়ি দূষিত হবেনা;
- মাছচাষের শুরু থেকে আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে চাষীর এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করা যাতে উৎপাদিত মাছ বা চিংড়ি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

২. নিরাপদ মৎস্য ও চিংড়ি কী

নিরাপদ মৎস্য ও চিংড়ি হলো- খামারে উৎপাদিত মৎস্য ও চিংড়ি সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত এবং তাতে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কোন উপাদান না থাকা।

৩. খামারের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুসরণীয় প্রধান প্রধান উত্তম অনুশীলনসমূহ

প্রত্যেক চাষীকে চাষের প্রতিটি পর্যায়ে গুড প্র্যাকটিস অনুসরণ করতে হবে ঃ

৩.১ খামারের অবস্থান সম্পর্কিত

- আশেপাশের বাড়িঘর, গৃহপালিত পশুর খামার, আবর্জনা ইত্যাদি হতে পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন স্থানে খামার নির্মাণ করতে হবে ;
- খামার নির্মাণের সম্ভাব্য স্থানে অতীতে কীটনাশক, ভারী ধাতু ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এবং বর্তমানে মাটিতে তার কোন অবশেষ (Residue) বিদ্যমান আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ;
- ক্ষতিকর জীবাণু আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ।

৩.২ মৎস্য/চিংড়িচাষে ব্যবহৃত পানি সম্পর্কিত

- পার্শ্ববর্তী নদী, খাল, বিল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে খামারে পানি দূষণের সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে হবে ;
- খামারের পানিতে ক্ষতিকর জীবাণু (কলিফর্ম, স্যালমোনেলা), ভারী ধাতু (আয়রন, জিংক, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, লেড, মার্কারি, কোবাল্ট, ক্যাড্‌মিয়াম), কীটনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি আছে কিনা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে;
- কলকারখানা ও নর্দমার দূষিত পানি ঘেরে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে ;

- খামারে বৃষ্টির গড়ানো পানির প্রবেশ বন্ধ করতে হবে ।

৩.৩খামারের আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কিত

- বন্যা প্রবণ, ময়লা-আবর্জনার স্তুপের আশেপাশে খামারের স্থান নির্বাচন করা যাবে না ।
- খামারের আশেপাশের ঝোঁপ-ঝাড়, জলজ আগাছা, ময়লা আবর্জনা যা ক্ষতিকর জীবাণুবাহী প্রাণীকে আকৃষ্ট করতে পারে তা পরিষ্কার করতে হবে ।
- খামারের পাড়ে বা আশেপাশে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না ।
- খামারেপশু-পাখীর বিচরণ বন্ধ করতে হবে ।

১.৪ খামারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা

- খামার প্রাঙ্গন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (জাল, বাকেট, বাস্কেট ও অন্যান্য সরঞ্জাম) পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে ।
- একবার ব্যবহৃত সরঞ্জাম পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে জীবাণূমুক্ত করতে হবে । এক খামারের সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত না করে অন্য খামারে ব্যবহার করা যাবে না ।
- খামারে কর্মচারী ও মানুষের যথেচ্ছ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ।
- খামারে কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে হবে ।
- গৃহপালিত পশু-পাখির গোবর বা বিষ্ঠা সার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না ।
- খামারে কর্মরত লোকজনকে ঘের বা পানির উৎস সংলগ্ন এলাকায় মলমূত্র ত্যাগ করতে দেয়া যাবে না ।

৩.৫ মৎস্য/চিংড়ির খাদ্য সম্পর্কিত যত্ন ও সতর্কতা

- কেবল নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হবে । খাদ্যের মান ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে ২-৩ মাসের মধ্যে সংরক্ষিত খাবার ব্যবহার করে ফেলতে হবে ;
- খাদ্যের ব্যবহৃত উপকরণের গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং তাতে ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক বা রাসায়নিকের উপস্থিতি আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে ;
- মৎস্য বা চিংড়ির বর্ধনের জন্য হরমোন জাতীয় কোন উপাদান খাদ্যে ব্যবহার করা যাবে না ;
- পুরানো, বাসি, মেয়াদ উত্তীর্ণ, দুর্গন্ধ ও ছত্রাকযুক্ত নিম্নমানের খাবার ব্যবহার করা যাবে না ;
- কাঁচা খাবার সরাসরি ঘেরে ব্যবহার করা যাবে না ;
- পরিষ্কার, শুষ্ক ও ঠান্ডা পরিবেশে পাকা মেঝে প্লাটফর্ম এর উপর খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে ;
- খাদ্য গুদামে জীবাণুবাহী তেলাপোকা, ছুঁচো, ইঁদুর, বেজি, পাখি, ইত্যাদির প্রবেশ বন্ধ করতে হবে ।

৩.৬ ঔষধ ব্যবহার সম্পর্কিত

- কেবল সর্বশেষ উপায় হিসেবে অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে ;
- ঔষধ সংরক্ষণে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ;
- সঠিক ব্যবহারবিধি মেনে ঔষধ ব্যবহার করতে হবে ;
- ঔষধ ব্যবহারের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে ;
- অবশেষ নিঃশেষের সময়(Withdrawal period) মেনে চলতে হবে ।

৩.৭ মৎস্য/ চিংড়ি আহরণ সংক্রান্ত

- মৎস্য/চিংড়ি আহরণের পূর্বে ক্ষতিকর জীবাণু (স্যালমোনেলা, কলেরা, ই.কলাই) ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে ;
- মৎস্য বা চিংড়ি আহরণের ২ দিন আগে থেকে খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে ;
- ভোরে অথবা ঠান্ডা আবহাওয়ায় চিংড়ি আহরণ করতে হবে;
- মৎস্য/চিংড়ি সংরক্ষণে পানযোগ্য পানি দিয়ে তৈরি বরফ ব্যবহার করতে হবে ;
- আহরিত মৎস্য/চিংড়ি বরফঠান্ডা পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। আহরণের সাথে সাথে প্রতি কেজি মৎস্য/চিংড়িতে এক কেজি বরফ দিয়ে সংরক্ষণ ও দ্রুত পরিবহন করতে হবে ;
- বরফ পরিবহনে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে ।

৩.৮ মৎস্য/চিংড়িচাষের সামাজিক ও পরিবেশগত

- খামারের জমির বৈধ মালিকানা থাকতে হবে ;
- আশেপাশের জলজ ও স্থলজ পরিবেশ এবং বন্য প্রাণীর আবাসস্থল নষ্ট করতে পারে এমন জায়গায় খামার তৈরি করা যাবে না ;
- উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক জলাভূমি ধ্বংস করে পুকুর/ঘের তৈরি করা যাবে না ;
- গুরুত্বপূর্ণ পানির প্রবাহকে পরিবর্তন করতে হবে এমন জায়গায় মৎস্য/চিংড়ি চাষ করা যাবে না ;
- আশেপাশের জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা ও যাতায়াত ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন জায়গায়মৎস্য/চিংড়িচাষ করা যাবে না
- খামার/ঘেরের কারণে যাতে মাটি ও আশেপাশের জলাশয়ের লবণাক্ততা বৃদ্ধি না পায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে ;
- খামারের কালো মাটি ও বর্জ্য শোধন না করে বাইরে কোথাও ফেলা যাবে না ।

৩.৯ মৎস্য ও চিংড়িচাষে শ্রম অধিকার ও শিশু শ্রমের ব্যবহার সম্পর্কিত

- শ্রমিকের লিখিত নিয়োগপত্র থাকতে হবে ;
- শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী খামারে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে ;
- শ্রমিকদের ঘোষিত ন্যূনতম মজুরী ও প্রাপ্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে ;
- খামারে ১৪ বছরের কম বয়সের কোন শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না

উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বিষয়ক কয়েকটি বিশেষ বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. মাঘ মাসে পুকুর প্রস্তুতি

মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ফাল্গুন মাস হতে মাছের উৎপাদন বর্ষ শুরু হয়। মাছের উৎপাদন বছরের শুরুতেই পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতির কাজ মাঘ মাসেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এটি মাছ চাষে সাফল্যের প্রথম সোপান। এক্ষেত্রে নিচের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করণীয়ঃ

১.১ পাড় মেরামত

১.২ চুন প্রয়োগ

১.৩ সার প্রয়োগ

২. ফাল্গুন মাসে চাপের পোনা মজুদ

রুইজাতীয় মাছের বেলায় এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ গত বছরের শীত পার করা ও চাপেরাখা পুরাতন চাপের পোনার বয়স বেশি হওয়ার কারণে এগুলো মৌসুমের শুরু হতেই দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলে খুব কম সময়েই এগুলো বাজারজাত করা যায়।

৩. **নির্বাচিত প্রজাতির নির্দিষ্ট সংখ্যায় ওঅনুপাতে বড় মাপের গুণগত মানসম্মত পোনা মজুদ**

উৎপাদন বছরের শুরুতে নির্বাচিত প্রজাতির বড় মাপের নির্দিষ্ট সংখ্যক গুণগত মানসম্মত পোনা নির্দিষ্ট অনুপাতে মজুদ করা মাছ চাষে সাফল্যের তৃতীয় সোপান। সাধারণত পোনা যত বড় হবে উৎপাদন তত বেশি হবে। মৎস্য অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশ নকৃত পরীক্ষিত ভালো হ্যাচারি হতে গুণগত মানসম্মত পোনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

৪. **পোনা টেকসইকরণ ও সঠিক নিয়মে জলাশয়ে অবমুক্তকরণ**

৫. **প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং দৈনিক নিয়মিত সুষম সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ গোবর বা হাঁসমুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করা চলবেনা।**

৬. **মাসে মাসে জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষণ**

৭. **আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে জীবন্ত মাছ বিপণন**

পুকুর রেকর্ড বই ব্যবহার

ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহৎ সকল আকারের মাছচাষ ব্যবসার উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। মুনাফা অর্জন নির্ভর করে সকল প্রকার ব্যয় ও আয়ের তথ্য যথাসময়ে নির্ভুলভাবে লিখে রাখা এবং এই দুটোর পার্থক্য থেকে লাভ অথবা ক্ষতির পরিমাণ বের করার ওপরে। তথ্য লিখে রাখলে শুধু লাভ -ক্ষতির হিসেবই করা সম্ভব নয় , ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপনার কোন পরিবর্তন আনতে হলে সে বিষয়ে বিশ্লেষণও সম্ভব। এনএটিপি -২ প্রকল্প মূলত: ক্ষুদ্র চাষিদের মাছচাষে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। অল্প পরিমাণে মাঝারি চাষিও আছেন। প্রধানত : পুকুরে মাছচাষের প্রযুক্তি প্রদর্শনীগুলোতে ব্যবহারের জন্য 'পুকুর রেকর্ড বই' সরবরাহ করা হয়েছে।

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের চাষিদের জন্য 'পুকুর রেকর্ড বই ' টি আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে। বৃহৎ চাষিদের অবশ্য ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন দিক লিখে রাখার জন্য আরও বিস্তারিত রেকর্ড বই ব্যবহার করতে হবে।

- শুধু প্রযুক্তি প্রদর্শনী পুকুর মালিকই নন , সংশ্লিষ্ট সিআইজির বাকী ১৯ জন সদস্যও তাদের নিজ নিজ পুকুরের রেকর্ড বই সংরক্ষণ করবেন।

- ভবিষ্যতে নন -সিআইজি চাষিগণকেও এই রেকর্ড বই এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তাদেরকে এটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। **অর্থাৎ সকল মৎস্যচাষির 'পুকুর/জলাশয় রেকর্ড বই' থাকতে হবে।**

- রেকর্ড বই এর উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ে সঠিক তথ্য যথাসময়ে লিখে রাখতে হবে। **মনে রাখতে হবে যে**
- **প্রকল্পের উৎপাদনমূলক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার উৎস্য একটি সেটি হলো 'পন্ড রেকর্ড বই'।**

সকল প্রযুক্তিগ্রহণকারী চাষি (সিআইজিভুক্ত এবং সিআইজি- বহির্ভূত) পুকুর রেজর্ড বই এর নমুনা প্রদর্শনী চাষির নিকট অথবা উপজেলা কার্যালয়ে দেখতে পারেন এবং ফটোকপি করে নিতে পারেন।

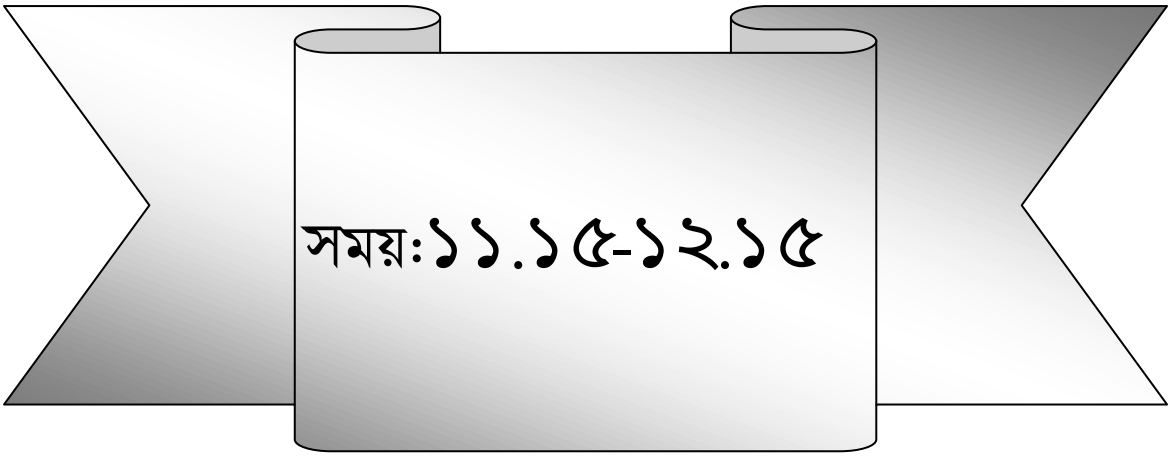

➢ মাছচাষ প্রযুক্তি গ্রহণ: প্রকল্পে গৃহীত প্রধান মাছচাষ প্রযুক্তিসমূহ

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১ **সময়: ১১:১৫-১২:১৫** **মেয়াদকাল:** ৬০ মিনিট

শিরোনাম: মাছচাষ প্রযুক্তি গ্রহণ: প্রকল্পে গৃহীত প্রধান মাছচাষ প্রযুক্তিসমূহ

অভীষ্ট দল: মাছচাষ-**প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষি**

লক্ষ্য: এ অধিবেশনে মাছচাষ-প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষিদের চাষযোগ্য মাছ ও চিংড়ির মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন ধরনের মাছ ও চিংড়ির চাষ পদ্ধতি এবং পুকুরের ধরন সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে এ সমস্ত প্রজাতির চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে পারেন ।

উদ্দেশ্য: *এ অধিবেশন শেষে* মাছচাষ-প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষি*গণ* মাছ ও চিংড়ির চাষযোগ্য প্রজাতির-

- বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- আবাসস্থল ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সম্ভাব্য দৈহিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বিভিন্ন ধরনের মাছচাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৩ মিনিট
	• স্বাগত জানানো • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫২ মিনিট
	• মাছচাষের প্রযুক্তিগ্রহণ • চাষিগণ কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি প্রধান মাছচাষ প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ ভিপ কার্ড, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, মাল্টিমিডিয়া, ইত্যাদি ।			

মাছচাষের প্রযুক্তিগ্রহণ এবং প্রযুক্তি গ্রহীতা

এনএটিপি-২ প্রকল্পটি মূলত কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ, বিশেষ করে চাষ প্রযুক্তি, মাঠ পর্যায়ে চাষিদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। সার্বিক দৃষ্টিতে মৎস্য চাষও কৃষিকর্মে অন্তর্ভুক্ত। দেশের গবেষনা কেন্দ্রগুলো যে সব মৎস্যচাষ প্রযুক্তির উদ্ভাবন /উন্নয়ন ঘটাচ্ছেন, প্রধানত মৎস্য অধিদপ্তর কতৃক তার কার্যকর সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেসব মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য: উৎপাদন বাড়ানো এবং উন্নততর বাজারজাতকরণ পদ্ধতির অনুসরণ। উন্নত মৎস্যচাষ পদ্ধতিসমূহ ২০ জন চাষির সমন্বয়ে গঠিত সিআইজির (সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট দল বা Common Interest Group) নিকট পৌঁছানো হচ্ছে -- প্রথমত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত প্রযুক্তিভিত্তিক মৎস্যচাষ প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে। সিআইজি সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত একজন চাষি প্রদর্শনী স্থাপনের দ্বায়িত্ব পেলেও এর ফল ভোগ করেন সকল সদস্যই। প্রদর্শনী কার্যক্রম দেখে সকলেই যেমন উন্নত মাছচাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন তেমনি উন্নত ফলাফল দেখে একই পদ্ধতি নিজেদের পুকুরে ব্যবহার করে বাড়তি মুনাফা অর্জনের জন্য উৎসাহিত হন সকলেই । এক্ষেত্রে প্রদর্শনী-চাষি ব্যাতিত অন্য সকলে প্রযুক্তি গহণকারীতে পরিগণিত হন। সিআইজিভুক্ত চাষিগণ ছাড়াও এলাকার অন্যান্য সাধারণ চাষিরাও একইভাবে উন্নত প্রযুক্তিতে উৎসাহিত হয়ে থাকেন। তাছাড়া, মাঠ দিবসে যে সকল সিআইজি-বহির্ভূত চাষি অংশগহণ করে থাকেন তারাও প্রদর্শনীর ফলাফল জেনে প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং নিজেদের পুকুরে তা বাস্তবায়ন করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তি (যেমন- পুকুর প্রস্তুতি হতে শুরু করে চূড়ান্ত আহরণ প্রর্যন্ত) অথবা তার অংশবিশেষ (যথা- পোনা মজুদ বা খাদ্য প্রয়োগ; দুটোই বা যেকোন একটি) আগ্রহী চাষি কর্তৃক তাদের নিজস্ব পুকুরে ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে যেসকল চাষি (সিআইজিভুক্ত অথবা সিআইজি- বহির্ভূত) নতুন প্রযুক্তি গহণ করেছেন তাদেরকে প্রকল্প প্রযুক্তি-গহণকারী হিসেবে বিবেচনা করবে।

নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সকল চাষির জানার জন্য উল্লেখ করা হলো। যেন একজন চাষি নিজে যেটি অনুসরণ করেছেন তার বিকল্প বা অধিক পছন্দের চাষপ্রযুক্তি প্যাকেজটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারেন এবং ভবিষ্যতে অনুসরণের জন্য এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারেন।

১. রুই জাতীয় মাছ ও চাষ প্রযুক্তি
২. তেলাপিয়া মাছ (মনোসেক্স) ও চাষ প্রযুক্তি
৩. পাঙ্গাস মাছ ও চাষ প্রযুক্তি
৪. কৈ মাছ ও চাষ প্রযুক্তি
৫. শিং মাছ ও চাষ প্রযুক্তি
৬. পাবদা মাছ ও চাষ প্রযুক্তি
৭. গুলশা মাছ ও চাষ প্রযুক্তি
৮. মাছের নার্সারী ও ব্যবস্থাপনা (**রুই-জাতীয় মাছ,** শিং মাছ ও পাবদা মাছ)

১. রুই-জাতীয় মাছ ও চাষ প্রযুক্তি

চাষযোগ্য প্রধান প্রধান রুইজাতীয় মাছের পরিচিতি

রুই

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

রুই মছের মাথা দেহের তুলনায় ছোট, দেহ লম্বাটে। লেজের দিক ক্রমশ সরু। সমস্ত শরীর উজ্জ্বল আঁশ দিয়ে ঢাকা, আঁশগুলো গোলাকার, মসৃণ এবং সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। এদের ঠোঁট কুঁচকানো, খাঁজ কাটা, উপরের ঠোঁটে এক জোড়া শুং থাকে।

খাদ্যাভ্যাস

রুই মাছ সাধারণভাবে পানির মধ্যস্তরে বিচরণ করে এবং স্তরে বিদ্যমানে খাদ্যগ্রহণ করে থাকে। তবে পানির উপর এবং নিচের স্তরেও এমাছের অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রাণি-প্লাংকটন, পচা জৈব পদার্থ ও ছোট কীট প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আর সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ফিশ মিল, খৈলের গুঁড়া, চালের কুড়া, গমের ভুষি গ্রহণ করে।

প্রজনন

অনুকূল পরিবেশে ২ বছর বয়সে রুই প্রজননক্ষম হয় এবং মে- জুলাই মাসে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন ঘটায়। অপেক্ষাকৃত কম গভীর এবং স্রোতশীল পানিতে এরা ডিম ছাড়ে। বদ্ধ জলাশয়ে রুই মাছের প্রজনন ঘটে না। তবে হ্যাচারিতে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে রেণু উৎপাদন হয়। একটি প্রজনন উপযোগী স্ত্রী রুই থেকে ৩ লক্ষাধিক ডিম পাওয়া যেতে পারে।

কাতলা

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

কাতলা মাছের মাথা বেশ বড়, দেহের মাঝের অংশ চওড়া। মুখের হা বেশ বড়, নিচের ঠোঁট মোটা এবং সামনের দিকে প্রশস্ত। দেহের রং রূপার মত চকচকে সাদা তবে পিঠের রং কিছুটা কালচে।

খাদ্যাভ্যাস

কাতলা সাধারণভাবে পানির উপর স্তরে বিচরণ করে। এরা ছোট অবস্থায় প্রধানত প্রাণি-প্লাংকটনভোজী। তবে কৈশোরের পর থেকে পুকুরের পরিবেশ থেকে শেওলা, ছোট কীট, উদ্ভিদের খন্ডাংশ, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে গমের ভুষি, চালের কুড়া, ফিশমিল, খৈল গ্রহণ করে।

প্রজনন

প্রাকৃতিক পরিবেশ ৩ বছর বয়সেই কাতলা পরিপক্ব হয়। তবে বাংলাদেশের পরিবেশে পুকুরে চাষকৃত মাছ ৪ বছরের আগে পরিপক্ব প্রজননক্ষম হয় না বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এ মাছ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। মে-জুলাই মাসে স্রোতযুক্ত নদীতে ডিম পাড়ে। সেখানে থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করে চাষ করা যায়। বর্তমানে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমেই বেশির ভাগ রেণু উৎপাদন করা হয়ে থাকে। প্রজনন উপযোগী বয়সে কাতলা মাছ হতে ৪-৫ লক্ষ ডিম পাওয়া যেতে পারে।

মৃগেল

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

দেহ লম্বাটে ও কিছুটা গোলাকার। মাথা খুবই ছোট কিন্তু মুখের গহ্বর অপেক্ষাকৃত বড়। গায়ের রং পিঠের দিকে তামাটে, দু'পাশ ও পেট রুপালী। মৃগেল মাছের ঠোঁট পাতলা ও উপরের ঠোঁট কিছুটা লম্বাটে এবং নিচের দিকে বাঁকানো।

খাদ্যাভ্যাস

মৃগেল মাছ জলাশয়ের তলদেশে স্তর থেকে খাদ্যগ্রহণ করে। প্রাণি-প্লাংকটন, তলার ছোট/বড় কীট-পতঙ্গ, পচা জৈব পদার্থ, কাদা, বালি ইত্যাদি মৃগেলের খাদ্য। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুঁড়া, ফিসমিল, গমের ভুষি, সরিষার খৈল খায়।

প্রজনন

মৃগেল মাছ ১ বছর বয়সেই পরিপক্ব হয়। কারও কারও মতে এ মাছ ৬ মাসেই পরিপক্ব হয়ে থাকে। একই বয়সের পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আগে পরিপক্বতা অর্জন করে। পরিণত বয়সে ১ কেজি ওজনের একটি মৃগেল মাছ হতে ১ লাখ ডিম পাওয়া যেতে পারে। এ মাছও বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। মে- জুলাই মাসে স্রোতযুক্ত নদীতে ডিম দেয়। এপ্রিল মাস থেকেই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রেণু উৎপাদন করতে দেখা যায়।

কালবাউশ

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

দেহের তুলনায় মাথা ছোট। সমস্ত দেহ কালো বা ধূসর কালো আঁশ দিয়ে ঢাকা, চোখ লাল রংয়ের, মুখের দুই পাশে একজোড়া করে গোঁফ থাকে। রুই ও কাতলা মাছের তুলনায় কম বর্ধনশীল।

খাদ্যাভ্যাস

কালবাউশ নিচের স্তরে বাস করে এবং নিচের স্তরেই খাদ্য সংগ্রহ করে। পরিণত বয়সে পচা ও অর্ধপচা জলজ উদ্ভিদ এবং কীটপতঙ্গ খায়। পোনা অবস্থায় এককোষী শেওলা, পচা ও অর্ধপচা জলজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

প্রজনন

২য় বৎসরে কাল বাউশ মাছ প্রজননশীল হয়। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম দেয় না। বর্ষাকালে স্রোতশীল পানিতে ডিম দেয়। হ্যাচারিতে ইনজেকশন প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে প্রজনন করানো হয়। বাংলাদেশে সকল অঞ্চলেই হ্যাচারিতে এই মাছের পোনা পাওয়া যায়।

গ্রাস কার্প

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

দেহ লম্বাটে, মাথা চওড়া, মুখ ছোট, ঠোঁট সামান্য লম্বা। শরীরের রং পেটের দিকে রুপালী সাদা কিন্তু পিঠের দিক কালচে ধূসর বা সবুজাভ, গলার ভিতরে চিরনির দাঁতের মতো দু'সারি দাঁত রয়েছে। সারা শরীর মাঝারি আকারের আঁশ দ্বারা আবৃত।

খাদ্যাভ্যাস

গ্রাসকার্প প্রধানত তৃণভোজী স্বভাবের। পোনা অবস্থায় এরা প্রাণি-প্লাংকটন ও মশার লার্ভা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয় এবং পুকুরের পরিবেশ থেকে ঝাঁঝি, হাইড্রিলা, স্পাইরোডেলা, ক্ষুদি পানা, কুটি পানা, নরম ঘাস ইত্যাদি খেতে শুরু করে। বাইরে থেকে সরবরাহকৃত কলার পাতা, আলুর পাতা, সজনে পাতা, শীতকালীন শাকশব্জি খেতেও এরা বেশ পছন্দ করে। গ্রাসকার্প দৈনিক দেহের ওজনের প্রায় ৪০-৫০% উদ্ভিদ জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে পারে।

প্রজনন

পুরুষ ও স্ত্রী মাছ যথাক্রমে ২ ও ৩ বছরে পরিপক্বতা অর্জন করে। পুকুরে বা বদ্ধ জলাশয়ে এদের পরিপক্বতা আসে কিন্তু প্রজনন করে না। কৃত্রিম উপায়ে মে-আগস্ট মাস পর্যন্ত এদের প্রজনন করানো হয়। একটি পরিপক্ব গ্রাসকার্প মাছ হতে প্রায় ২ লাখ পর্যন্ত ডিম পাওয়া যেতে পারে।

সিলভার কার্প

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

সিলভার কার্প দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মত দেহের মাঝের অংশ চওড়া, মাথা লেজের অংশ সরু। মুখ কাতলা মাছের মতো উপরের দিকে তোলা। দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুপালী আঁশে ঢাকা। মাথা ও পিঠের দিক গাঢ় ধূসর। এদের নালীর দৈর্ঘ্য গ্রাসকার্প অপেক্ষা বেশি এবং ফুলকায় অনেকগুলো ফুলকা রেকার বর্তমান বলে পানি থেকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ-প্লাংকটন গ্রহণ করতে পারে।

আদি বাসস্থান

দক্ষিণ ও মধ্য চীনের নদীসমূহে এবং আমুর নদীর অববাহিকা মাছটির আদি বাসস্থান। সেখান থেকেই এ মাছচাষ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৬৯ সালে হংকং থেকে আমাদের দেশে আনা হয় এবং ১৯৭৬ সালে সফলভাবে কৃত্রিম প্রজনন ঘটানো সম্ভব হয়। এরা নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় এর পানির উপরের স্তরে বিচরণ করে।

খাদ্যাভ্যাস

অপেক্ষাকৃত ছোট পোনা সাধারণত প্রাণি-প্লাংকটন খেতে অভ্যস্ত। পোনার আকার কিছুটা বড় হলে এরা উদ্ভিদ-প্লাংকটন খেয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে এবং বাকি জীবন প্রধানত উদ্ভিদ-প্লাংকটন খেতে খুবই পছন্দ করে।

প্রজনন

সিলভার কার্প ২ বছরের মধ্যেই প্রজননক্ষম হয়। এ বয়সের একটি মাছ হতে সর্বাধিক ৮ লক্ষ পর্যন্ত ডিম পাওয়া যেতে পারে। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম দেয় না, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা হয়। মার্চের শেষ দিকে এদের প্রজনন মৌসুম শুরু হয়।

কার্পিও

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

কার্পিও এর মাথা শরীরের তুলনায় ছোট, পেট মোটা এবং পিঠ ধনুকের মতো বাঁকানো। এর গায়ের রং হালকা সোনালি-বাদামি। সারা দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে।

আবাসস্থল

হাওর-বাঁওড় ও পুকুরের পানির নিচের স্তরে বাস করে। পুকুরের তলদেশ থেকে এ মাছ খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্যের জন্য এরা পুকুরের তলদেশ, পাড় ও চারপাশের মাটি খামচে আলগা করে। রেণু অবস্থায় এরা প্রাণি-প্লাংকটন ভক্ষণ করে। পরিণত বয়সে প্লাংকটন, ছোট/বড় কীট, ছোট, শামুক, কেঁচো, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে।

প্রজনন

৫-৬ মাসেই এ মাছ প্রজননক্ষম হয়। এরা বদ্ধ জলাশয়ের অনুকুল পরিবেশে প্রাকৃতিক প্রজননে অভ্যস্ত এবং বছরে দু'বার (জানুয়ারি-মার্চ ও জুলাই- আগষ্ট) প্রজনন করে। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমেও এ মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

থাই সরপুঁটি

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

উজ্জ্বল রুপালি রঙের দেহ, লেজটি খাঁজকাটা, পায়ু ও শ্রোণী পাখনার প্রান্ত রক্তিম গোলাপী। মাছের নাসাগ্র গোলাকার এবং মুখে দু'জোড়া গোঁফ থাকে। মাছটি চ্যাপ্টা।

খাদ্যাভ্যাস

রেণু অবস্থায় এরা এককোষী শেওলা ও ছোট প্রাণি-প্লাংকটন খায়। পরিণত অবস্থায় এরা উদ্ভিদভোজী। উদ্ভিদ হিসেবে ক্ষুদি পানা, হাইড্রিলা, নরম ঘাস, পেঁপে পাতা, আলু পাতা, বাধাঁকপি ইত্যাদি এদের খুবই প্রিয় খাদ্য। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুড়া ও সরিষার খৈল পছন্দ করে।

প্রজনন

থাই সরপুঁটি ১ বছরেই প্রজননক্ষম হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে এরা প্রজনন করে। এরা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন করা হয়। তবে বিশেষ অবস্থায় যেমন হ্যাচারি সংলগ্ন পুকুরে যদি পানির প্রবাহ থাকে কিংবা বৃষ্টির পানি যদি পুকুরে গড়িয়ে ঢোকার সুযোগ থাকে তাহলে পুকুরেও প্রজনন করতে সক্ষম।

চাষ পদ্ধতি

পুকুর নির্বাচন: বাণিজ্যিক মাছচাষের জন্য অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পুকুর, ৪০ শতাংশ বা তদূর্ধ হওয়া বাঞ্চনীয়। পানির গভীরতা ৪ থেকে ৬ ফুটের মধ্যে হলে ভাল হয়। মাটি দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ এবং পুকুরটি আয়তাকার হওয়া উত্তম।

পুকুর প্রস্তুতি

পাড় ও তলদেশ: পাড়ে ঝোপ-ঝাড় থাকলে পরিস্কার করতে হবে। পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে (কমপক্ষে দৈনিক ৮ ঘন্টা) সূর্যালোক প্রবেশের সুবিধার্থে সম্ভব হলে বড় গাছ কেটে ফেলতে হবে। সম্ভব না হলে অন্তত ভেতর দিকের ডাল-পালা কেটে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশন করে পুকুরের পাড় মেরামত ও তলদেশ অতিরিক্ত কর্দমুক্ত করে সমান করতে হবে। অন্যথায় পুকুরের পানির গুণাগুণ দ্রুত খারাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া, তলদেশ সমান না হলে পরবর্তীতে মাছ আহরণ করা কঠিন হবে।

* **জলজ আগাছা ও অবাঞ্চিত মাছসহ রাক্ষুসে মাছ দুরীকরণ:** যদি পানি প্রাপ্তি বিশেষ সমস্যা না হয় তাহলে পুকুরের পানি নিষ্কাশন করে সব জলজ আগাছা এবং অবাঞ্চিত মাছসহ রাক্ষুসে মাছ অপসারণ করা যেতে পারে। পানি প্রাপ্তি সমস্যা হলে, প্রথমে পুকুরে বারবার জাল টেনে যতদূর সম্ভব সকল মাছ ধরে ফেলতে হবে। এরপর অবশিষ্ট সব মাছ ধরে ফেলার জন্য প্রতিশতক আয়তন ও প্রতিফুট পানির গড় গভীরতার জন্য ২৫-৩০ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ৪ ফুট পানির গড় গভীরতার এক একর পুকুরে ১০-১২ কেজি রোটেনন লাগবে।

* **চুন প্রয়োগ:** রোটেনন প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে প্রয়োগের ২/১ দিন পর প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। এই হারে এক একর জলায়তন বিশিষ্ট পুকুরের জন্য চুন লাগবে ১০০ কেজি।

* **সার প্রয়োগ:** সাধারণভাবে একটি পুকুরে প্রস্তুতকালীন সারের সুপারিশকৃত মাত্রা নিম্নরূপ:

সার	প্রয়োগমাত্রা/শতক
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৭৫

টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ইউরিয়ার প্রয়োগমাত্রা অর্ধেক হবে।

পোনা মজুদ

রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের জন্য প্রথমে মাছের প্রজাতি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে, পুকুরের উপরের স্তরের উপযুক্ত শুধু মাত্র সিলভার কার্প মাছ ছাড়া যেতে পারে আবার সিলভারের সাথে বিগহেড বা কাতলা মাছের পোনা ছাড়া যেতে পারে। কিন্তু বিগহেড এবং কাতলা একত্রে ছাড়া যাবে না কারণ তারা পরস্পর একই খাবার খায়। সিলভারের সাথে কাতলা মাছের পোনা ছাড়লে সিলভার কার্পের পোনা ছাড়ার কয়েক দিন আগে কাতলা মাছের পোনা ছাড়তে হবে এবং কাতলার পোনা অবশ্যই আকারে তুলনামূলক বড় হতে হবে। মিশ্রচাষে থাই সরপুটি মাছের পোনা বেশি ছাড়লে রুই মাছের বর্ধন কম হবে। তবে সরপুটি মাছের বর্ধন হার বেশি হওয়ায় চাষের তিন মাসের মধ্যে বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে সরপুটি আগেই বিক্রয় করে দেয়া গেলে রুই মাছের বর্ধন স্বভাবিক রাখা যেতে পারে। মিশ্র চাষে ৮ ধরনের কার্পের পোনা এক সাথে চাষ করা যায়। সব প্রজাতির পোনা একই এলাকায় একই সময়ে নাও পাওয়া যেতে পারে। এলাকাভিত্তিক প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করেই কার্পের পোনার জাত নির্বাচন করা উচিত। পুকুরে বড় আকারের (কার্পঃ ১০-১৫ সেমি) এবং চাপের

পোনা (Over Wintering) ছাড়া হলে কম সময়ে বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়। বর্তমানে বাণিজ্যিক চাষে অনেক বড় আকারের পোনা এমনকি ১ কেজি বা তার চেয়ে বড় আকারের মাছও মজুদ করতে দেখা যায়। প্রয়োজনীয় আকারের পোনা এক উৎস থেকে না পাওয়া গেলেও মাছের অধিক ফলন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে হলেও অধিক সময় এবং শ্রম ব্যয় করে উপযুক্ত আকারের পোনা সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে।

সময় ও সতর্কতা: পুকুর প্রস্তুতির ৪/৫ দিন পর যখন পানি হালকা সবুজ রঙ ধারণ করবে তখন পোনা মজুদ করা যাবে। 'চাপের পোনা' ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসেই মজুদ করা হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা পুকুরে ছাড়ার সময় পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পাত্রের পানি পুকুরের পানির সাথে কিছুটা সময় নিয়ে অল্প অল্প করে পরিবর্তন করতে হবে, যেন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পি এইচ (pH) ক্রমশ পুকুরের পানির মত হয়ে যায়। এর পর পাত্রের পানিসহ মাছ ধীরে ধীরে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

মজুদ ঘনত্ব

দেশে এখন অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মজুদ হার ব্যবহৃত হচ্ছে, এতে সংখ্যার পাশাপাশি পোনার ওজনও কম-বেশি হয়। পদ্ধতি ও প্রজাতিভেদে পোনার আকার ২৫০ গ্রাম থেকে ১.৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। প্যাডল হুইলে বা এ্যারেটরের সাহায্যে পানিতে অক্সিজেন মিশ্রণ ও পানি প্রবাহ তৈরির সুযোগ থাকলে মজুদ হার বাড়ানো এবং বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব। সফল মজুদহারসমূহের ভিত্তিতে গঠিত চারটি মজুদ মডেল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মডেল-১: পোনার ওজন ২৫০-৪০০ গ্রাম				**মডেল-২: পোনার ওজন ৪০০-৭৫০ গ্রাম**		
প্রজাতি	**সংখ্যা/বিঘা (৩৩ শতাংশ)**	**সংখ্যা/একর**		**প্রজাতি**	**সংখ্যা/বিঘা (৩৩ শতাংশ)**	**সংখ্যা/একর**
কাতলা	১৫-২০	৪৫-৬০		কাতলা	৫০	১৫০
সিলভার কার্প	১৬০-২২০	৪৮০-৬৬০		সিলভার কার্প	১০০	৩০০
রুই	১৬০-২২৫	৪৮০-৬৮০		রুই	১৫০	৪৫০
মৃগেল/কালবাউস	৯০-১০০	২৭০-৩০০		মৃগেল/কালবাউস	১০০	৩০০
গ্লাস কার্প	১৫-২০	৪৫-৬০		**মোট**	**৪০০**	**১২০০**
মিরর কার্প	৮০-৯০	২৪০-২৭০				
গ্লাস কার্প	৫-১০	১৫-৩০				
মোট	**৫২৫-৬৮৫**	**১৫৭৫-২০৬০**				

মডেল-৩: পোনার ওজন ৭৫০ গ্রাম- ১ কেজি				**মডেল-৪: পোনার ওজন ১ কেজি- ১.৫ কেজি**		
প্রজাতি	**সংখ্যা/বিঘা (৩৩ শতাংশ)**	**সংখ্যা/একর**		**প্রজাতি**	**সংখ্যা/বিঘা (৩৩ শতাংশ)**	**সংখ্যা/একর**
কাতলা	২৫	৭৫		কাতলা	২০	৬০
সিলভার কার্প	৭০	২১০		রুই	৯০	২৭০

রুই	১২০	৩৬০		মৃগেল/কালবাউস	৫০	১৫০
মৃগেল/কালবাউস	৬০	১৮০		**মোট**	**১৬০**	**৪৮০**
গ্রাস কার্প	১০	৩০				
মোট	**২৮৫**	**৮৫৫**				

কোন কোন অঞ্চলে শিং, মাগুর শতকে ১৫-১৮টি হারে রুই-জাতীয় মাছের সাথে মিলিয়ে চাষ করা হয়। বাজারজাত করার উপযোগী হয়ে গেলে বড় মাছগুলো ধরে বিক্রয় করে দিয়ে সমসংখ্যক পোনা পুন:মজুদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে।

পোনার উৎস

বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের চাহিদা পুরণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'চাপের পোনা' মাছের খামার গড়ে উঠেছে। কোন কোন সরকারী মৎস্য খামার বা অন্য কোন ভাল উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করে বা অনেক চাষি নিজেরাই খামারের আলাদা ইউনিটে এই ধরনের বিশেষ পোনা তৈরি করে নিতে পারেন।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গ্রাস কার্পের জন্য আলাদাভাবে কচি ঘাস, ক্ষুদি পোনা, কলাপাতা ইত্যাদি প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে দিতে হবে। এ ছাড়া বাকি সব মাছ প্রধানত তৈরি সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। খাবার চাষি নিজে তৈরি করে নিতে পারেন অথবা বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করা তৈরি পিলেট খাবার ব্যবহার করতে পারেন। মাছের ওজন গড়ে ১.৫ কেজি হওয়া পর্যন্ত সঠিকভাবে নমুনায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেহের ওজনের ৩% হারে প্রতিদিন দিতে হবে। এ খাবার সমান দুভাগে ভাগ করে সকাল-বিকাল সমহারে দেয়া যায়। মাছের গড় ওজন ১.৫ কেজির বেশি হয়ে গেলে খাদ্য প্রদান হার ধীরে ধীরে পুকুরে মাছের মোট ওজনের ২.৫% এ নামিয়ে আনতে হবে। পনের দিন পরপর নমুয়ান করতে হবে এবং মজুদকৃত প্রতিটি প্রজাতিকে নমুনায়ানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেবল নির্ভরযোগ্য এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করে চলা খাদ্য প্রস্তুতকারীর নিকট হতে খাবার ক্রয় করতে হবে। প্রয়োজনে চাষি নিজেও নিম্নোক্ত ভাবে খাবার তৈরি করে নিতে পারেন। এতে করে একদিকে যেমন খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা যাবে তেমনি তা মূল্য সাশ্রয়ী হবে।

প্রতি ১০০ কেজি খাদ্য তৈরিতে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার মাত্রা

খাদ্য উপাদান	**পরিমাণ (কেজি)**
চালেক কুড়া/গমের ভুষি	৪৯.৫০
সরিষার/তিলের খৈল	২০.০০
ফিশমিল/প্রোটিন কনসেনট্রেট	২০.০০
আটা	৫.০০
চিটাগুড়	৫.০০
ভিটামিন ও খনিজ	০.৫০

মোট	**১০০**

মাছ চাষকালীন সার প্রয়োগ

রুই জাতীয় মাছের কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে যারা সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। আর পুকুরে সার দিলে এই প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মায়। পোনা ছাড়ার পর পুকুরে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকলে মাছের ভাল ফলন পাওয়া যাবে না। অধিক ফলন পেতে পুকুরে নিয়মিত সার দিতে হয়। সার দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক ভিত্তিতে দেয়া যায়। তবে মাত্রানুযায়ী সার প্রতিদিন প্রয়োগ করা হলে উত্তম ফল লাভ করা সম্ভব। পানির রং অবশ্যই হালকা সবুজ বা বাদামী সবুজ রাখা উচিত। সূর্যালোকিত দিনে দুপুরে পানির রং পর্যবেক্ষণ উত্তম। এ কাজটি নিজের চোখেই করা উচিত। সেকিডিস্কের দৃশ্যমানতা অবশ্যই ২০-২৫ সে.মি. রাখা উচিত। প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে একবার সেকি ডিস্কের সাহায্যে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাপ করা উচিত। রুইজাতীয় মাছ চাষে নিয়মিত সার প্রয়োগে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি করে পানির রং সবুজ রাখা হলে সম্পূরক খাদ্য কিছুটা কম হলেও মাছের ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উৎপাদন খরচও অনেক কম পড়ে।

সারণি: মজুদ পরবর্তী দৈনিক ও সাপ্তাহিক সার প্রয়োগের নমুনা (শতাংশ)

সারের ধরন	**সারের নাম**	**দৈনিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)**	**সাপ্তাহিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)**
অজৈব	ইউরিয়া	৫-৭	৪০-৫০
অজৈব	টিএসপি	১০-১২	৭০-৮০

শীতকালে পানির তাপমাত্রা ১১° সে. এর নিচে নেমে গেলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। সে হিসেবে বছরে প্রায় ৩০০ দিন সার প্রয়োগ করলেই চলে। সারের কার্যকারিতা ভাল পেতে পুকুরে সার প্রয়োগের আগে হালকা মাত্রায় চুন প্রয়োগ করা উত্তম। জৈব সার টিএসপি সারের সাথে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ছিটানোর আধা ঘন্টা পূর্বে ইউরিয়া সার পূর্বে ভিজিয়ে রাখা জৈব সার ও টিএসপি'র সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। সকাল ১০:০০ টার মধ্যে এই সার সমস্ত পুকুরে ছিটাতে হবে। প্রতিদিন সার প্রয়োগে সমস্যা হলে পুকুরের পানির রং পর্যবেক্ষণ করে ১২-১৫ দিন পর প্রতি শতাংশে নিম্ন হারে সার দেয়া যেতে পারে। তবে সম্পুরক খাদ্য ব্যবহারের জন্য সারের পরিমান কমবেশী হতে পারে।

সারের নাম	**সারের পরিমাণ**
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
টিএসপি	১৫০-২০০ গ্রাম

আহরণ

* ফেব্রুয়ারী-মার্চে মজুদ করে ডিসেম্বরের মধ্যেই সব মাছ ধরে ফেলতে হবে;
* বাজার চাহিদার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক করা প্রয়োজন;
* ভোর বেলায় মাছ ধরতে হবে।

উৎপাদন

বর্ণিত পদ্ধতিতে একর প্রতি মাছের উৎপাদন ৪-৫ টন পাওয়া সম্ভব।

সম্ভাব্য উৎপাদন ব্যয়, আয় ও মুনাফা

জলায়তন ১.০০ একর

সময়কাল: ৮-৯ মাস

ব্যয়ের খাত	ব্যয় (টাকা)
ইজারামূল্য, পুকুর প্রস্তুতি, রোটেনন, চুন সার ইত্যাদি (থোক)	৬০,০০০.০০
পোনা: বিভিন্ন মডেলের গড় (মডেল ভেদে তারতম্য হবে)	৮০,০০০.০০
খাবার: ৯০০০ কেজি x ৪০ টাকা	৩,৬০,০০০.০০
অন্যান্য (শ্রমিক, জালটানা, ঔষধপত্র, বাজারজাতকরণ)	৪,০০,০০.০০
ব্যাংক সুদ (১০% হারে, ৯ মাসের জন্য)	৩৯,৩৭৫.০০
মোট ব্যয়	**৫,৭৯,৩৭৫.০০**

আয়: উৎপাদন ৪৫০০ কেজি x ১৯০ টাকা প্রতি কেজি হারে

= ৳ ৮,৫৫,০০০.০০

ব্যয়: ৳ ৫,৭৯,৩৭৫.০০

মুনাফা: ৳ ৮,৫৫,০০০.০০ - ৳ ৫,৭৯,৩৭৫.০০ = ৳ ২,৭৫,৬২৫.০০

২. তেলাপিয়া মাছ ও চাষ প্রযুক্তি

ভূমিকা

তেলপিয়া দ্রুত বর্ধনশীল সুস্বাদু মাছ। দেখতে আকর্ষণীয় এবং অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় চাষ লাভজনক। এ মাছ একক, মিশ্র, সমন্বিত পেনে ও খাঁচায় চাষ করা যায় বলে বাংলাদেশে এর চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশে পাঁচ ধরণের তেলাপিয়া চাষ হয় যেমন- মোজাম্বিক তেলাপিয়া, নাইল তেলাপিয়া, লাল তেলাপিয়া, গিফ্‌ট তেলাপিয়া এবং মনোসেক্স তেলাপিয়া। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জাতের গিফ্‌ট তেলাপিয়া অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় চাষি ও খামারীদের কাছে এ মাছ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। গিফ্‌ট তেলাপিয়া থেকে উৎপাদিত মনোসেক্স (এক লিঙ্গ) পুরুষ তেলাপিয়া আরও দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় এর চাষ ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- তেলাপিয়া মাছ সুস্বাদু এবং দেখতে আকর্ষণীয় হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই একে বৈশ্বিক মাছ বলা হয়;
- সর্বভুক বিধায় মাছ চাষে উৎপাদন খরচ কম হয় এবং চাষ লাভজনক;
- রোগ প্রতিরোধক্ষম এবং প্রকৃতির বিরুপ পরিবেশে এবং অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়; এবং
- স্বাদু ও লবণাক্ত পানি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে চাষ করা যায়।

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য: তেলাপিয়ার সমস্ত শরীর আঁইশে ঢাকা। মাথা ছোট। পৃষ্ঠ পাখনা কাঁটাযুক্ত। বক্ষ পাখনা ছোট। একই বয়সের পুরুষ তেলাপিয়া স্ত্রী অপেক্ষা বড়। মোজাম্বিক তেলাপিয়া আকারে ছোট, রং ধুসর থেকে কালো। এর উৎপাদনশীলতা কম। নাইল তেলাপিয়া দেখতে ধুসর নীলাভ থেকে সাদা লালচে। পুরুষ মাছের গলার অংশে লালচে এবং স্ত্রী মাছের বর্ণ লালচে হলুদাভ। আকার আকৃতি অন্য সব তেলাপিয়ার মতই কিন্তু রং লাল এবং এর উৎপাদন কম বলে জনপ্রিয়তা পায়নি। গিফ্‌ট তেলাপিয়ার লেজের আড়াআড়ি রেখা সমূহ নিরবচ্ছিন্ন। নাইল তেলাপিয়ার গায়ের রং এর চেয়ে এটির গায়ের রং হালকা। মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছগুলি সম আকৃতির গিফ্‌ট তেলাপিয়ার মতো উচ্চ ফলনশীল, তাপমাত্রার সহনশীল মাত্রা ১২-৩৫° সে., ২-৮ পিপিএম অক্সিজেন এবং ৩-২৫ পিপিটি লবণাক্ততায় বাঁচতে পারে। মনোসেক্স তেলাপিয়া অধিক উৎপাদনশীল জাত, এরা কম অক্সিজেন এবং বিস্তৃত তাপমাত্রায় খাপ খাওয়াতে সক্ষম।

চাষ ব্যবস্থাপনা

পুকুর নির্বাচন: পুকুর নির্বাচনের ওপর তেলাপিয়ার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। সাধারণ মাছ চাষের জন্য পুকুর নির্বাচনের সাথে তেলাপিয়া চাষের জন্য উপযুক্ত পুকুরের বৈশিষ্ট্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ করা হলে পুকুরের গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে।

পুকুর প্রস্তুতি: যে কোন ধরণের মাছ চাষের ন্যায় তেলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রেও নিয়মিতভাবে পাড় ও পাড়ের ঢাল মেরামত, তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণ, পুকুরের তলদেশ সমান করা এবং পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী পাড়ের বড় গাছের ডাল পালা ও পাড়ের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করতে হবে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে:

- পুকুর শুকিয়ে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা সবচেয়ে উত্তম। এতে পুকুরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পুকুর শুকানো না গেলে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায়:
    - রোটেনন পাউডার: ২০-৩০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য।
    - চা বীজের খৈল: ১৪০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানির জন্য।

বিষাক্ততার মেয়াদ ৭-১০ দিন। ঐসময় পুকুরের পানি ব্যবহার ও গোসল নিষিদ্ধ।

- ব্লিচিং পাউডার: শতাংশ প্রতি ১৫-২০ গ্রাম
- ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে রোগ জীবাণু নির্মূল করা যায়।

ব্লিচিং পাউডার অবশ্যই গুলে ছিটাতে হবে এবং খোলা ব্লিচিং পাউডার ক্রয় ও ব্যবহার করা যাবে না।

চুন প্রয়োগ: তেলাপিয়ার পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রতিটি ধাপে এর প্রয়োগ অনিবার্য। পুকুরের মাটি ও পানির পিএইচ মান এবং রোগের লক্ষণ অনুযায়ী চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পুকুর প্রস্তুতির ধাপে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ: সাধারণত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (ফাইটোপ্লাংকটন) বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ করা হয়। সার প্রয়োগের অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাথমিক উৎপাদকের (ফাইটোপ্লাংকটন) জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান-নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম (NPK) সরবরাহ করা যা জৈব ও অজৈব উৎস (সার) থেকে পাওয়া যায়। বর্ণিত উপাদানসমূহ শুকনো পুকুরের কাদা থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্ত হয় বিধায় পুকুর শুকানোর পরে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শতাংশ প্রতি ২০০ গ্রাম চালের কুড়া, ১০০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ১ গ্রাম বেকারী ইষ্ট মিশিয়ে ইষ্ট মোলাশিস তৈরী করে

প্রয়োগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, জৈব সারের উৎস হিসেবে গোবর অথবা মুরগীর বিষ্ঠা প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ এসব দ্রব্যাদি মাছের রোগ বিস্তারে সহায়ক, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের অন্তরায়।

ইষ্ট মোলাশিস প্রস্তুত ও প্রয়োগ

- **একটি পাত্র বা ড্রামে প্রয়োজনীয় চালের কুড়া, চিটা গুড় ও বেকারী ইষ্ট একত্রে মিশিয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন।**
- **২৪ ঘন্টা পর উপরের স্বচ্ছ পানি পুকুরে ঢেলে দিন এবং সমপরিমাণ পানি দিয়ে ড্রাম ভরুন।**
- **পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা পর ড্রামের সমুদয় দ্রব্য (ইষ্ট মোলাশিস) পুকুরে প্রয়োগ করুন।**

- **খাদ্য নিরাপত্তার চেয়ে নিরাপদ খাদ্য বেশী জরুরী।**
- **পুকুরে গোবর ও হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠার ব্যবহার পরিহার করতে হবে।**

পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

তেলাপিয়া চাষের জন্য বিশ্বস্থ উৎস হতে ভাল জাতের মনোসেক্স পোনা সংগ্রহ করতে হবে। পুকুর প্রস্তুতের সময় হতে পোনা সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করতে হবে। সাধারণতঃ হ্যাচারিসমূহ হতে ২১-২৪ দিন বয়সের ধানী পোনা সরবরাহ করা হয়। এ ধরণের পোনা সরাসরি বড় পুকুরে চাষ করলে পোনার মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় মাছের জীবভর (Biomass) বের করতে সমস্যা হয়। সেজন্য নার্সারি পুকুরে পোনা প্রতিপালন করে ১০-১৫ গ্রাম আকারের পোনা পুকুরে ছাড়া ভাল। পোনা মজুদের ২ দিন পূর্বে শতাংশ প্রতি ৪০০ গ্রাম জিওলাইট, ৫ মি.লি./মি.গ্রাম গ্যাস নিরোধক, ৩-৫ মি.গ্রাম জীবাণুনাশক প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও পোনা ছাড়ার ২-৩ ঘন্টা পূর্বে প্রতি শতাংশে ৩০ গ্রাম সোডিয়াম পারকার্বনেট প্রয়োগ করে পানি অক্সিজেন সমৃদ্ধ করা যায়।

- **উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি এ্যারেটর/পানির ঝর্ণা দিয়ে পুকুরের পানির অক্সিজেন বৃদ্ধি করে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া (Digestibility) বৃদ্ধি করতে হবে অন্যথায় উচ্ছিষ্ট খাদ্যের পচন ক্রিয়ায় মাছ মারা যেতে পারে।**
- **খাদ্য গুদামের মেঝে শুকনা এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, তেলাপোকার নাগালের বাহিরে রাখতে হবে।**

মজুদ ঘনত্ব

মজুদ পুকুরে পোনা ছাড়ার হার বা মজুদ ঘনত্ব নিম্নের বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরশীলঃ

- ❖ চাষির মাছ চাষের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও চাষির আর্থিক সামর্থ;
- ❖ চাষের সময়কাল ও মাছ চাষের ধরনঃ একক, মিশ্র, আধা নিবিড় বা নিবিড়;
- ❖ খাদ্যের ধরণ যেমনঃ ভেজা খাবার, পিলেট বা কারখানায় তৈরী ভাসমান খাবার;
- ❖ চাষকালীন ব্যবস্থাপনা যেমনঃ পুকুরে নিয়মিত পানি পরিবর্তন, এ্যারেটর ব্যবহার ইত্যাদি;
- ❖ আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ২০০-২৫০টি তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা যেতে পারে। এর সাথে কার্প জাতীয় মাছের পোনা ১৫-২০ টি এবং শিং মাছের পোনা ১৫-২০টি মজুদ করা যেতে পারে।

পোনা পরিবহণ ও শোধনঃ তেলাপিয়া পোনা পরিবহণের সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। পোনা ধরে পাকা চৌবাচ্চায় রেখে ৬-৮ ঘন্টা টেকসই করে পলিব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পরিবহন করতে হবে। সমআকারের (৫-৭ সে.মি.) পোনা সকালে/বিকেলে শোধন করে খাপ খাওয়ায়ে মজুদ পুকুরে ছাড়তে হবে।

তেলাপিয়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ তেলাপিয়া চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তেলাপিয়া চাষ সম্পূর্ণরূপে সম্পূরক খাদ্য নির্ভর। একটি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের প্রায় ৬০% ব্যয় হয় মাছের খাদ্য ক্রয়ে। এক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে, লাভজনকভাবে খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে খাদ্যের গুণাগুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেলাপিয়ার খাদ্যে ৩০-৩৫% আমিষ থাকা বাঞ্চনীয়।

খাবার প্রয়োগঃ মাছের দৈহিক ওজনের ১০% থেকে ৩% হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। মাছ ছোট অবস্থায় ৪ বার খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত। মাছের গড় ওজন ২০ গ্রাম হলে দিনে ৩ বার খাদ্য প্রয়োগ করাই উত্তম। পিলেট খাবার পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানসমূহে নির্দিষ্ট সময়ে এবং পরিমাণমত দিতে হবে। পোনা মজুদের পর ৩০-৩৫% আমিষ সমৃদ্ধ কৃত্রিম খাদ্য দৈহিক ওজনের ১০-৩% হারে নিম্নের ছক আনুযায়ী প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ

সপ্তাহ	খাদ্য প্রয়োগের হার	খাদ্যের প্রকার	
১ম দুই সপ্তাহ	১০%	স্টার্টার-২	● **উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি এ্যারেটর/পানির ঝর্ণা দিয়ে অক্সিজেন বাড়িয়ে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া (Digestibility) বৃদ্ধি করুন। অন্যথায় উচ্ছিষ্ট খাদ্যের পচন ক্রিয়ায় মাছ মারা যেতে পারে।**
২য় দুই সপ্তাহ	৮%	স্টার্টার-৩	
৩য় দুই সপ্তাহ	৭%	স্টার্টার-৩	
৪র্থ দুই সপ্তাহ	৬%	স্টার্টার-৩	
৫ম দুই সপ্তাহ	৫%	গ্রোয়ার-১	
৬ষ্ট দুই সপ্তাহ	৪%	গ্রোয়ার-১	
৭ম দুই সপ্তাহ	৪%	গ্রোয়ার-২	
৮ম দুই সপ্তাহ	৩%	ফিনিশার-২	

প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার নমুনায়ন করে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। দৈনিক সকাল বিকেল দুবার খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৫০ শতক পুকুরে তেলাপিয়া চাষের (এক ফসল) আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	সংখ্যা/ পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট (টাকা)	মন্তব্য
১.	ইজারা মূল্য (৬ মাস)	৫০ শতক	থোক	১০,০০০.০০	
২.	পুকুর সংস্কার ও প্রস্তুতি	৫০ শতক	থোক	২,০০০.০০	
৩.	চুন	৫০ কেজি	১৫/-	৭৫০.০০	
৪.	পোনা ক) তেলাপিয়া (১০-১৫ সে.মি.) খ) রুই (১৫-২০ সে.মি.)	 ১২,৫০০টি ১০০টি	 ১.৫০ ১০/-	 ১৮,৭৫০.০০ ১০০০.০০	-

	গ) সিলভার কার্প (১০-১৫ সে.মি.) ঘ) কাতলা (১৫-২০ সে.মি.) ঙ) শিং (৫-৭ সে.মি.)	১০০টি ৫০টি ১০০০টি	৩/- ১০/- ২/-	৩০০.০০ ৫০০.০০ ২০০০.০০	
৫.	কৃত্রিম খাদ্য (৩০% আমিষ, FCR ১.৫)	২৮৪৬.৫ কেজি	৪০/-	১,১৩,৮৬০.০০	-
৬.	ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি	থোক	থোক	১৫,০০০.০০	-
৭.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	১০,০০০.০০	-
৮.	**উপমোট ব্যয়**			**১,৭৪,১৬০.০০**	
৯.	**ব্যাংক ঋণের উপর ৮% সুদ**			**১৩,৯৩২.৮০**	-
১০.	**সর্বমোট**			**১,৮৮,০৯২.৮০**	

উৎপাদন ও আয়

পোনার মজুদ সংখ্যা	**মৃত্যু হার (আনুমানিক)**	**বেঁচে থাকা মাছের সংখ্যা**	**গড় ওজন (গ্রাম)**	**মোট ওজন (কেজি)**	**একক মূল্য (টাকা)**	**মোট মূল্য (টাকা)**
তেলাপিয়া- ১২,৫০০টি	১০%	১১,২৫০টি	২৫০	২৮১২.৫০	৮০/-	২,২৫,০০০.০০
রুই মাছ- ১০০টি	১০%	৯০টি	৫০০	৪৫.০০	১৮০/-	৮,১০০.০০
সিলভার কার্প-১০০টি	১০%	৯০টি	৫০০	৪৫.০০	৬০/-	২,৭০০.০০
কাতলা-৫০টি	৫%	২৫টি	৭৫০	১৮.৭৫	১৫০/-	২,৮১২.৫০
শিং -২০০০টি	১০%	১,৮০০টি	০.০২	৩৬.০০	৩০০/-	১০,৮০০.০০
			সর্বমোট	**২৯৫৭.২৫**		**২৪,৪১২.৫০**

নীট আয়ঃ আয় - ব্যয়= ২,৪৯,৪১২.৫ - ১,৮৮,০৯২.৮ = ৳ ৬১,৩১৯.৭০

৩. পাংগাস মাছ ও চাষ প্রযুক্তি

আমাদের দেশের নদনদীতে এক সময় প্রচুর পাংগাস মাছ পাওয়া যেত। নদী থেকে পোনা সংগ্রহ করে দেশীয় পাংগাসের চাষ সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তা লাভজনক হয়নি। বিশেষ করে পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত না করতে পারায় দেশীয় পাংগাস চাষ তেমন অগ্রসর হয় নাই। দেশী পাংগাসের জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশীয় পাংগাসের অনুরূপ পাংগাস মাছ আমদানী করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারিতে থাই পাংগাসের রেণু এবং পোনা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন হচ্ছে। ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর, কুমিল্লা অঞ্চলসহ দেশের প্রায় অধিকাংশ এলাকায় থাই পাংগাস চাষের সম্প্রসারণ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। দেশীয় রুই জাতীয় মাছের তুলনায় এ মাছের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি হওয়ায় এ মাছ পুকুরে আধা নিবিড়/নিবিড় পদ্ধতিতে একক/মিশ্রচাষ হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে মাছের চাহিদা পূরণে এমাছ এক বিশেষ

ভূমিকা রেখে চলেছে। এ মাছ বদ্ধ জলাশয়ে তথা পুকুরে চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তাছাড়া পেনে, খাঁচায় ও উন্মুক্ত জলাশয়ে এ মাছের চাষও করা হচ্ছে। পাংগাস বর্তমানে দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

পাংগাস মাছের পরিচিতি

বাংলাদেশের নদীতে সনাতন যে পাঙ্গাস পাওয়া যায় তার বৈজ্ঞানিক নাম *Pangasius pangasius*। বিগত ১৯৯০ সনে থাইল্যান্ড থেকে যে পাঙ্গাস এনে বাংলাদেশের পুকুরে পাঙ্গাস চাষের প্রবর্তন করা হয় তা ছিল *Pangasius sutchi*। ইদানীং এনএটিপি- ২ প্রকল্প যে পাঙ্গাস চাষে বিশেষভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে সেটি হলো সাদা পাঙ্গাস বা ভিয়েতনামী পাঙ্গাস *Pangasianodon hypophthalmus*। বুঝাই যাচ্ছে তিন ধরনের পাঙ্গাসের মধ্যে পার্থক্য আছে।

পাংগাস মাছচাষের সুবিধা ও গুরুত্ব

আমাদের দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ মাছের ভূমিকা অপরিসীম। সেকারণে কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি পাংগাস মাছের বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। আরো যেসব কারণে পাংগাস মাছচাষ গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এ মাছ চাষে অত্যন্ত উপযোগী;
- মাছটি দ্রুত বর্ধনশীল, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং স্বল্প অক্সিজেন মাত্রায় বেচে থাকে;
- মৌসুমি, বাৎসরিক ও অগভীর, ছোট-বড় সকল জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়;
- এ মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু, এর বাজার চাহিদা এবং যথেষ্ট বাজার মূল্য আছে;
- এ মাছে রোগ বালাই কম হয় এবং পরিবেশ তারতম্য সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশি;
- আধা-নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে;
- এ মাছ ৬-৭ মাস চাষে খাবার উপযোগী ও বাজারজাতকরণ করা যায়;
- জীবন্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাজারজাত করা যায় ফলে নিশ্চিতভাবে উত্তম মূল্য পাওয়া যায়;
- এ মাছের পোনা উৎপাদন সহজ এবং সর্বত্র পাওয়া যায়;
- এমাছ থেকে ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট উৎপাদন করে বিদেশে প্রেরণ করার সুযোগ রয়েছে।

পাংগাস মাছ চাষ পদ্ধতি

পাংগাস মাছ একটি সর্বভূক মাছ। এরা নদীর মাছ হলেও পুকুরে সাফল্যজনকভাবে চাষ করা হচ্ছে। যেহেতু মাছটি দ্রুত বড় হয়, পরিবেশের তারতম্য সহ্য করতে পারে, অল্প জায়গায় অনেক বেশি উৎপাদন হয় সে জন্য চাষি এ মাছ চাষ অব্যাহত রেখেছে। পাংগাস মাছের সাথে অন্যান্য প্রজাতির মাছ একত্রে চাষ করে কিভাবে অধিক লাভ নিশ্চিত করা যায় মাঠ পর্যায়ে চাষিরা সে চেষ্টা করে যাচ্ছে নিরন্তরভাবে।

সাধারণ মাছ চাষের জন্য পুকুর নির্বাচনের সাথে পাংগাস চাষের জন্য উপযুক্ত পুকুরের বৈশিষ্ট্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ করা হলে পুকুরের গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে। সব আকারের পুকুরে এমাছ চাষ করা যায় তবে মাঝারী থেকে বড় পুকুর (৫০-৩০০ শতাংশ) সবচেয়ে উপযোগী।

চাষের সময় কাল

চাষির নিজস্ব নার্সারিতে পোনা মজুদ থাকলে শীতের পরে মার্চের শুরুতেই পোনা মজুদ করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লালন পালন করলে মাছের গড় ওজন ১.০-১.৫ কেজি হয়ে যায়। শীতের পরে ১-২ মাস ভালভাবে খাবার প্রয়োগ করে মাছ বাজারজাত করলে মাছের আকার বড় হয় এবং ভাল দামও পাওয়া যায় তবে পাংগাস চাষে শীতকাল পরিহার করতে পারলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

পাংগাস মাছ চাষে মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

পুকুরে মাছের পোনা মজুদের আগে বেশ কিছু কাজ করতে হয়। এ কাজগুলো মাছচাষে সফলতা লাভ করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পুকুর প্রস্তুতিঃ

যে কোন ধরণের মাছ চাষের ন্যায় পাংগাস চাষের ক্ষেত্রেও নিয়মিতভাবে পাড় ও পাড়ের ঢাল মেরামত, তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণ, পুকুরের তলদেশ সমান করা এবং পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী পাড়ের বড় গাছের ডাল পালা ও পাড়ের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করা করতে হবে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবেঃ

পুকুরের আগাছা পরিস্কার করাঃ পুকুরে জলজ আগাছা থাকলে তা সম্পূর্ণ পরিস্কার করতে হবে। আগাছা মাছ চাষে নানবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে। বিভিন্নভাবে পুকুর থেকে আগাছা দূর করা যায়। তবে যান্ত্রিক উপায়ে কায়িক পরিশ্রমে (Manually) অপসারণ করাই উত্তম। জৈবিক বা রাসায়নিক পদ্ধতি তেমন কার্যকর নয়।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণঃ পুকুরে লাভজনকভাবে পাংগাস মাছ চাষের পূর্বশর্ত হলো সঠিকভাবে পুকুর প্রস্তুত করা। পুকুর প্রস্তুতের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পুকুরটি মাছ শুন্য করা। রাক্ষুসে মাছ দুর করার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে যেমনঃ বার বার জাল টানা, পুকুর শুকানো, রোটেনন প্রয়োগ, ফমিটক্স ট্যাবলেট প্রয়োগ ইত্যাদি। তবে পাংগাস চাষের ক্ষেতে পুকুর শুকিয়ে তলার কাদা দুর করে ফেলা উত্তম।

ব্লিচিং পাউডারঃ পাংগাস মাছ চাষে ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে বলে এ জন্য পুকুর প্রস্তুতির সময় ব্লিচিং পাউডার (৩০% ক্লোরিন) প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে পুকুরের তলদেশ দূষণমুক্ত করা প্রয়োজন। ব্লিচিং পাউডার পুকুরের জলজ পরিবেশের বা পুকুরের তলদেশের মাটির সকল ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংশ করে।

ব্লিচিং পাউডার পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইপোক্লোরাস এসিড ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয়। এই হাইপোক্লোরাস এসিড ফ্রি র‍্যাডিক্যাল অক্সিজেন রিলিজ করে যা ক্ষতিকারক অনেক জীবাণু ও অন্যান্য অর্গানিজম বিনষ্ট করে।

চুন প্রয়োগঃ মাছচাষে চুন প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। পুকুর প্রস্তুতের সময় পুকরের বিদ্যমান পিএইচ মাত্রার ওপর বা তলদেশের কাদার পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে শতাংশে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুনের কার্যকরীতা ভাল পেতে সাদা চাকা পোড়া চুন (CaO) প্রয়োগ করতে হবে। পাউডার চুন বা কলি চুন (Ca (OH)2) এর কার্যকরীতা ভাল থাকে না।

সার প্রয়োগঃ পাংগাস মাছ চাষে সাধারণত পুকুরে সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। তবে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির জন্য একবার সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। সারের মাত্রা পুকুর ভেদে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ১০০-১৫০ গ্রাম এবং টিএসপি ১০০-১৫০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কোনভাবেই পুকুরে জৈব সার তথা গোবর বা মুরগির বিষ্টা বা অন্য কোন অপদ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং উত্তম মাছ চাষ অনুশীলনের (Good Aquaculture Practice) পরিপন্থী।

পুকুরের ওপর বড় ফাঁসের জাল স্থাপনঃ পাংগাস মাছ পুকুরে অধিক ঘনত্বে চাষ করা হয়। সহজে শিকারী পাখি মাছ ধরতে না পারে সে জন্য সমস্ত পুকুরের উপর বড় ফাঁসের জাল স্থাপন করতে হয়। জালব্যতিত লম্বা সুতা পুকুরের আড়াআড়ি সারিসারি টানা দিয়েও এ কাজটি করা যেতে পারে। অন্যথায় প্রতিদিন মাছ শিকারী পাখিতে প্রচুর পরিমাণ মাছ খেয়ে ফেলবে এবং যা মাছ উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

মজুদ কালীন ব্যবস্থাপনা

পোনা সংগ্রহ ও পরিবহনঃ পাংগাস মাছের পোনা পরিবহন রুই জাতীয় মাছের পোনা পরিবহনের মত হলেও কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এ মাছ কাটা যুক্ত হওয়ায় বড় আকারের পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহন করা যায় না। পাংগাস মাছের চাষের জন্য সাধারণত বড় আকারের (১০০-২৫০ গ্রাম) পোনা মজুদ করা হয়। এ ধরনের পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন জটিল এবং ব্যয়বহুল। পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য চাষির নিজের একটি পুকুরে আগে থেকেই ছোট (১-২ ইঞ্চি) আকারের পোনা মজুদ করে লালন পালন করে নেয়া উচিত। এতে পোনার ব্যয় কমে আসবে এবং প্রয়োজনের সময়, নিদিষ্ট আকারের পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। পাংগাসের পোনা

সাধারণত প্লাষ্টিকের বড় আকারের ব্যারেলে পরিবহন করা হয়। একটি ব্যারেলে পোনার আকার ভেদে ৫০০-২০০০টি পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। দূরবর্তী স্থানে পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পানি পরিবর্তন করতে হবে। এ সময় ড্রামের পোনার পীড়ণ প্রশমিত করার জন্য এক প্যাকেট ওর স্যালাইন দেয়া যেতে পারে। পানিতে বাড়তি অক্সিজেনের উৎস হিসাবে সোডিয়াম পারকার্বনেট প্রয়োগ করা যেতে পারে। বেশি দূরে বা অধিক সময় ধরে পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে পোনার পরিমাণ কমিয়ে নিতে হবে।

পাংগাস মাছের পোনা পরিবহনে সতর্কতা

১) পুকুর থেকে পোনা পরিবহনের আগের দিন পুকুরে কোন খাবার দেওয়া যাবে না। পোনা পরিবহনের পূর্বে অবশ্যই পোনা টেকসই করে নিতে হবে। এ জন্য পোনা পরিবহনের কয়েক ঘন্টা আগে পানির ফোয়ারা যুক্ত হাউজে রাখতে হবে। পোনা পরিবহনের সময় একই আকারের পোনা পরিবহন করা উত্তম।

২) পাংগাস মাছের পোনা গায়ে আঁশ থাকে না কিন্ত তার তিনটি কাটা থাকে এ জন্য মাছের পোনা নার্সারি পুকুর থেকে ধরা বা কন্ডিশনিং হাউজ (Cistern) থেকে ধরার (Handling) সময় বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

৩) পোনা পরিবহনের সময় অধিক ঘনত্ব অবশ্যই পরিহার করতে হবে। পাত্রের পানি পরিবর্তনের সময় ক্রমান্বয়ে নতুন পানি যুক্ত করে পুরাতন পানি ফেলে দিতে হবে।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা: যদি পুকুর প্রস্তুতি পর্যায়ে কোন প্রকার বিষ প্রয়োগ করা হয় হবে পুকুরে পোনা মজুদের আগে অবশ্যই পানির বিষাক্ততা আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে। পুকুরে একটি হাপা বেধে তার ভিতরে কিছু পোনা মাছ ছেড়ে কয়েক ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করেও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

মজুদ ঘনত্ব: পাংগাস চাষের সফলতার অন্যতম প্রধান একটি নিয়ামক হচ্ছে মজুদ ঘনত্ব। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পুকুরে মাছ চাষে উদ্ভূত সমস্যার প্রধান কারণ অধিক হারে মাছের পোনা মজুদ। এজন্য পুকুরে পরিমাণ মত মাছ ছাড়তে হবে। এখানে পাংগাস মাছ বাণিজ্যিকভাবে চাষের অধিক প্রচলিত কয়েকটি মডেল উল্লেখ করা হল। পুকুরে পোনা মজুদের সময় পোনার আকার অবশ্যই ১০০ গ্রামের উপরে হলে ভাল হয়।

(প্রতি শতাংশে পোনা ছাড়ার সংখ্যা)

প্রজাতির নাম	**মডেল ১**	**মডেল ২**	**মডেল ৩**	**মডেল ৪**
পাংগাস	১৫০-৩০০	১০০-১৫০	৭৫-১০০	৫০-১০০
কার্পজাতীয়	৫-৮	৩-৫	৩-৫	২০-৪০
শিং বা মাগুর	-	৫০-১০০	-	-
তেলাপিয়া	-	-	৭৫-১২০	৫০-১০০

মডেল ১: এ পদ্ধতি পাংগাস মাছের একক চাষ বলা যেতে পারে। বর্তমানে একক পাংগাস চাষ কিছুটা কমে আসছে। এ পদ্ধতিতে বেশি হারে (২৫০-৩০০টি/শতাংশে) পোনা ছাড়লে মাছের আকার বেশি বড় করা যাবে না। অথবা পাংগাস মাছ যখন আধা কেজি আকারের হবে তখন অর্ধেক মাছ বিক্রয় করে দিয়ে বাকি মাছ বড় আাকারের করা যেতে পারে। মাছ আংশিক আহরণের সময় সব মাছকে বিরক্ত করা যাবে না পুকুরের এক প্রান্ত হতে বেড় জাল দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মাছ ধরে নিতে হবে। সবমাছ ধরে সেখান থেকে বাছাই করলে পুকুরে রেখে যাওয়া মাছের ক্ষতি হবে।

মডেল ২: এ পদ্ধতিতে পাংগাস মাছের সাথে শিং বা মাগুর মাছের চাষ লাভ জনক হিসাবে মাঠ পয়ায়ে প্রচলিত আছে। শিং এবং মাগুর মাছের পোনা একটু বড় আকারের (কেজিতে ৪০০-৫০০) ছাড়তে হবে। এখানে শিং বা মাগুর মাছ পাংগাসের খাবারের উপর নির্ভর করে চাষ পরিচালিত হয়। এখানে শিং বা মাগুর মাছের জন্য আলাদা খাবার দেবার প্রয়োজন হয় না।

মডেল ৩: পাংগাস মাছের সাথে তেলপিয়া মাছ চাষ করতে হলে তেলাপিয়ার পোনা নার্সারিতে ২৫-৩০ গ্রাম আকারের পোনা তৈরী করে নিতে হবে। অথবা তেলাপিয়ার (Mono-sex) পোনা আগে পুকুরে ছেড়ে নিয়ে ৩৫-৪০ দিন লালন পালনের পর পাংগাস মাছের পোনা ছাড়তে হবে। তেলাপিয়া মাছ পাংগাস মাছের সাথে দ্রত বড় হয়। এরা পুকুরের উচ্ছিষ্ট খাবার ও পুকুরের তলদেশের জৈব পদার্থ খেয়ে পুকুরের পরিবেশ ভাল রাখতে সহায়তা করে। এ পদ্ধতিতে তেলাপিয়ার একটি বাড়তি ফসল পাওয়া যায়। তেলাপিয়া বেশি দিলে পাংগাস মাছের সংখ্যা কমিয়ে দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে পাংগাস মাছের ডুবন্ত খাবারের সাথে তেলাপিয়ার জন্য ভাসমান খাবার বা উভয়ের জন্য ভাসমান বা ডুবন্ত যে কোন খাবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

মডেল ৪: পাংগাস. তেলাপিয়া এবং কার্প জাতীয় মাছ একত্রে চাষই এখন মাঠ পর্যায়ে বেশি প্রচলিত। বিশেষ করে পাংগাস মাছের দাম কমে যাওয়াতে চাষি তার মাছ চাষে লাভ নিশ্চিত করার জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ পদ্ধতিতে মাছের উৎপাদনও বেশি হচ্ছে এবং কার্প জাতীয় মাছের অধিক উৎপাদনর হচ্ছে ফলে মাছ বিক্রয়ে অধিক অর্থ উপার্জন হচ্ছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, পুকুরে পাংগাস মাছ দিলে চাষির পুকুরে খাবার দেবার বিষয়ে যে ভাবে যত্নবান থাকেন শুধু কার্পজাতীয় মাছের চাষে তেমনটি মনোযোগী থাকেন না। এ জন্য পাংগাস চাষের সাথে অন্যান্য প্রজাতির মাছের ফলন অধিকতর ভাল হয়। কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবশ্যই পাংগাসের পোনার মত আকারের অথবা কিছুটা বড় আকারের হতে হবে অন্যথায় কার্প জাতীয় মাছের বর্ধন ভাল হবে না।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার পরের কাজগুলোকে মাছ চাষের পরিচর্যাও বলা যেতে পারে। পোনা পুকুরে ছাড়ার পরে মাছের দ্রুত বর্ধনের জন্য যে কাজ করতে হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

পোনার মৃত্যুহার কমাতে করণীয়: যে কোন মাছ চাষের পুকুরে পোনা ছাড়ার পরদিন ভোরে পুকুরে পর্যবেক্ষণ করতে হবে কোন পোনা মারা গেছে কি না। যদি পোনা দুই একটি মারা যায় তবে আর ছাড়ার প্রয়োজন নাই তবে অধিক সংখ্যক পোনা মারা গেলে কি পরিমাণ পোনা মারা গেছে তা হিসাব করে পুনরায় সমপরিমাণ পোনা সংগ্রহ করে পুকুরে মজুদ করতে হবে। মজুদের প্রথম তিন দিন খাদ্যের সাথে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (১০ গ্রাম প্রতি কেজি খাবারের সাথে) মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এতে আঘাত প্রাপ্ত পোনার মৃত্যুহার কমে যাবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা: সাধারণভাবে ধারণা করা হয় মাছ চাষের মোট ব্যয়ের ৭০% ব্যয় হয় খাদ্য বাবদ। অতএব মাছচাষে খাদ্য অত্যন্ত প্রভাবশালী ফ্যাক্টর। পাংগাস সাধারণত তলদেশের খাবার খেয়ে বড় হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে মাঠপর্যায়ে পাংগাস মাছ চাষে ভাসমান খাবার ব্যবহার চাষের ধরণে পরিবর্তন এনেছে। পাংগাস মাছ চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চাষের মাছকে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হয়। কোন কারণে ২-৩ দিন খাদ্য প্রয়োগ বাদ পড়লে মাছ চাষে বা উৎপাদনে বড় ধরণের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বার বার এমনটি ঘটলে উৎপাদন এমনভাবে ব্যাঘাত ঘটতে পারে যে চাষি পাংগাস চাষে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন। অর্থাৎ বিনিয়োগকৃত পুঁজি ফেরত নাও পেতে পারেন। কোন কারণে যদি নিয়মিত ব্যবহৃত খাদ্য পাওয়া না যায় তবে মাছকে অভূক্ত রাখা যাবে না। প্রয়োজনে খৈল, গমের ভূঁষি বা অন্য যে কোন প্রকারের মাছের খাবার মাছকে খাওয়াতে হবে। পাংগাস মাছ চাষে অধিক ফলন নিশ্চিত করার জন্য পুকুরে সুষম ভাল মানের সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূরক খাবার দিয়ে চাষের জন্য অধিক আমিষ সমৃদ্ধ (২৮-৩০% এর অধিক) খাবার সরবরাহ করতে হয়। পাংগাস মাছের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মাত্রার আমিষ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন হয।

খাদ্য তৈরী: পাংগাস মাছের খাবার দুইভাবে তৈরি করা যেতে পারে।

নিজস্ব খামারে তৈরি (Supplementary Feed): এ মাছ চাষের জন্য নিজস্ব খামারে বা বাড়িতে সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। নিম্নে উল্লেখিত উপকরণ ব্যবহার করে খামারে পাংগাস মাছের খাবার তৈরী করা যেতে পারে। নিজস্ব খামারে খাবার তৈরি করে পাংগাস মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে মজুদ ঘনত্ব কিছুটা কম দিতে হবে।

ক্র.নং	**উপকরণের নাম**	**পরিমাণ (%)**	**প্রোটিন এর পরিমাণ**
১.	ফিসমিল বা মিট এন্ড বোনমিল	২০	১১
২.	সরিষার খৈল	২৫	৮.৫
৩.	সয়াবিন খৈল	১০	৪
৪.	অটোকুড়া	২৮	৩.৫
৫.	ভূট্টা	১০	১.৫
৬.	আটা	৩	০.৫
৭.	চিটাগুড়	২	
৮.	মাছের তৈল	০.৫	
৯.	ঝিনুকের গুঁড়া	০.৫	
১০.	ভিটামিন প্রিমিক্স (Growth Promoter)	১	
	মোট	**১০০%**	**২৯%**

খাদ্য তৈরিতে সরিষার খৈল ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। কারণ খৈলে মাছের বর্ধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদান আছে যা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ক্ষতিকর উপাদান প্রশমিত হয়।

বাণিজ্যিক খাবার বাজারে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন ব্রান্ডের খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। এধরনের খাদ্যের এফসিআর ভাল। যদিও পাংগাস পুকুরের তলদেশের মাছ তবে এরা ভাসমান খাবারও ভালভাবে গ্রহণ করে। ভাসমান খাবার খাওয়ালে খাবারের অপচয় রোধ করা যায় এবং মাছের তৃপ্ত মাত্রা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা যায়। মাছের খাদ্যে যদি মাইকোটক্সিন শোষণকারী উপাদান ও জৈব এসিড (Potassium Diformate) ব্যবহার করা যায় তাহলে সকল প্রধান পুষ্টি উপাদানের উন্নত হবে এবং খাদ্য মুল্য লাভজনক হবে।

খাদ্য প্রয়োগ: পুকুরে পোনা মজুদের পর মাছের মোট ওজনের ৮-৩% হারে ভাসমান বা ডুবন্ত খাবার দিতে হবে। মোট খাবারের অর্ধেক সকালে এবং বাকি অর্ধেক বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। খাবার পুকুরের নির্ধারিত স্থানে, নিদিষ্ট সময়ে দিতে হবে। বড় পকুর হলে খাবার একাধিক স্থানে দিতে হবে। ভাসমান খাবার দেয়ার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ খাবার মাছ খাচ্ছে সে পরিমাণ খাবার দিতে হবে।

খাবার প্রদান পদ্ধতি: পাংগাস মাছের পুকুরে বিভিন্নভাবে খাবার প্রয়োগ করা যেতে পারে। সাধারণত বেশিরভাগ পুকুরে, পুকুরের পাড় হতে পানিতে খাবার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়। পাংগাস মাছ খাবারের প্রতি খুব দ্রুত সাড়া দেয় এবং সকলে এক সাথে খাবার গ্রহণে প্রতিযাগিতায় লিপ্ত হয়। মাছ চাষের পুকুর বড় হলে পুকুরের একটি পাড় বরাবর খাবার দেয়া যেতে পারে।

অটোফিডার: যাদের পুকুরে বিদ্যুতের সংযোগ নেয়া সম্ভব তাঁরা অটোফিডার ব্যবহার করতে পারেন। এখানে একটি খাবার ধারণ করার পাত্র থাকে এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্র থাকে যাতে নির্দেশনা দিয়ে রাখা যায় কত সময় পরে কি হারে কতটুকু খাবার মেশিন পুকুরে

ছিটিয়ে প্রয়োগ করবে। মেশিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার পুকুরের একটি বড় অংশে ছিটিয়ে দেয়। এতে বিদ্যুতের খরচ বাড়লেও শ্রমিক কম লাগে।

নৌকা বা ভাসমান যানে খাদ্য প্রয়োগঃ পাংগাস মাছ চাষের পুকুর বড় আকারের হলে নৌকায় প্রয়োজনীয় খাদ্য নিয়ে পুকুরের মাঝ বরাবর খাবার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটিও একটি ভাল পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মাছের খাদ্য গ্রহণে প্রতিযোগিতা কম হবে। পুকুরের পাড়ের ক্ষতি হবে না।

নুমায়ন ও খাবারের পরিমাণ নির্ধারণঃ মাছচাষে কিছু মাছ ধরে মাছের গড় ওজন বের করে সমস্ত মাছের ওজন (Biomass) বের করে খাবারে পরিমাণ সমন্বয় করা প্রয়োজন। পাংগাস মাছের ক্ষেত্রে প্রতি ১৫-২৫ দিন অন্তর করা যেতে পারে। সঠিকভাবে নমুনায়নের জন্য মোট মাছের ১০% মাছ ধরে নমুনায়ন করতে হবে। মোট ওজন বের করার ক্ষেত্রে ৯০% বাঁচার হার ধরতে হবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নমুনায়নে উক্ত পরিমাণ মাছ ধরা কঠিন হয়। পাংগাস মাছের ক্ষেত্রে মজুদকৃত মাছ থেকে ৫০-১০০টি মাছ ধরে নমুনায়ন করা যেতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগে নিম্নবর্ণিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবেঃ

- প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য দেয়া যাবে না;
- খাদ্যে ছত্রাক হয়ে গেলে বা পঁচা এবং মেয়াদউত্তীর্ণ খাদ্য পুকুরে দেয়া যাবে না;
- বৃষ্টির দিনে খাবার কমিয়ে দিতে হবে;
- খাদ্য সংরক্ষণ স্থানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- পুকুরে প্রতিদিন একই স্থানে একই সময়ে এবং পরিমিত পরিমাণ খাবার দিতে হবে;
- খাবার অপচয় হলে তা পুকুরের পানির পরিবেশ নষ্ট করবে এবং পরিণতিতে মাছের নানা প্রকার সমস্যা সুষ্টি করবে;
- পাংগাস মাছের সাথে অন্য প্রজাতির মাছ থাকলে ভাসমান খাবারের সাথে কিছু ডুবন্ত খাবার দেয়া যেতে পারে;
- খাবার পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা করতে হবে ধাপে ধাপে। কারণ নতুন খাবারের স্বাদ বা গন্ধ একই রকম হবে না। মাছ খাদ্যের ঘ্রাণ, স্বাদ, আকার এবং খাদ্য প্রয়োগের সময় উৎপন্ন সাড়া অত্যন্ত প্রখরভাবে অনুসরণ করে। এ কারণে আগের প্রদত্ত খাবারের সাথে আংশিক মিশিয়ে ২-৩ দিন সময় নিয়ে খাদ্য পরিবর্তন করতে হবে। খাদ্যের আকার পরিবর্তনের সময়ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা ভালো।

সার প্রয়োগঃ

সাধারণত পাংগাস মাছ অধিক ঘনত্বে চাষ করা হয় এবং প্রতিদিন প্রচুর খাবার পুকুরে দিতে হয়। মাছ সে খাবার গ্রহণ করে পুকুরের পানিতে মল ত্যাগ করে এবং উচ্ছিষ্ট খাবারও পুকুরের তলদেশে জমা হয়ে পানির পুষ্টি বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে পুকুরে সার প্রয়োগ ছাড়াই পানি ক্রমান্বয়ে সবুজ থেকে গাড় সবুজ হয়ে যায়। পানির পরিবশে ভালো রাখায় অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। কোন কারণে সার ব্যবহার করতে হলে কেবল অজৈব সার (ইউরিয়া ও টিএসপি) পুর্বে উল্লেখিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়মিত পুকুরে খাদ্য এবং পরিচর্যা চালিয়ে গেলে ৫-৬ মাস বয়সে গড়ে মাছের আকার ১ কেজি হয়ে যাবে। এ আকারের মাছ বাজারজাত করার জন্য উপযুক্ত হয়। মাছ বাজারজাত করার সময় মাছের বাজার দর বিবেচনায় রাখতে হবে। মাছ আহরণের পূর্ব দিনে পুকুরে কোন প্রকার খাদ্য প্রয়োগ করা যাবে না। এতে আহরিত মাছ অনেক বেশি সময় সতেজ থাকে এবং মাছ Unwanted Flavour হতে মুক্ত থাকা যায়। পাংগাস মাছ জীবন্ত অবস্থায় বিক্রয় করা যায়। প্লাস্টিকের ড্রামে বড় ছোট (Grading) আলাদা করে বিক্রয় করা উত্তম। বাজারে প্রেরণের সময় পরিবহন পাত্রে অধিক ঘনত্বে পরিবহন না করাই ভাল। কারণ মাছ আঘাত প্রাপ্ত হলে বেশি সময় সজীবতা থাকে না এবং মাছের গাঁয়ের রং নষ্ট হয়ে যায়।

পাংগাস মাছ চাষের লাভ ক্ষতি বিশ্লেষণ

বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অল্প ব্যয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা। কাজেই সকল প্রকার মাছ চাষের বেলায় আয় ব্যায়ের হিসাব নিরুপণ করা অতীব জরুরী কাজ। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ চাষি আয় ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে করেন না। পাংগাস মাছের একক চাষের আয় ব্যয়ের নমুনা হিসাব (জলায়তন ৫০ শতাংশ):

ক্র.নং	উপকরণের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট খরচ	মন্তব্য
১.	সংস্কার			১৫,০০০.০০	
২.	চুন	১০০ কেজি	২০/-	২০০০.০০	
৩.	ইউরিয়া	১০ কেজি	২০/-	২০০.০০	
৪.	টিএসপি	১০ কেজি	৩০/-	৩০০.০০	
৫.	মাছের পোনা পাংগাস	৭৫০০টি	১০/-	৭৫০০০.০০	
৬.	কার্প	১৫০টি	৫/-	৭৫০.০০	
৭.	খাদ্য	১১৪৭৫ কেজি	৩৪/-	৩,৯০,১৫০.০০	
৮.	বিবিধ			১৫,০০০.০০	
			মোট খরচ	**৪,৯৮,৪০০.০০**	

উৎপাদন

পাংগাস মাছ (বাঁচার হার ৯০%, প্রতিটি কেজি) = ৬৭৫০ কেজি, মোট মূল্য ৬৭৫০ x ৯২ = ৬,২১,০০০.০০

কার্প জাতীয় মাছ (১০০ % বাচার হার) = ১৫০ কেজি, মোট মূল্য ১৫০ x ১৫০ = ২২,৫০০.০০

সর্বমোট = ৬,৪৩,৫০০.০০

নীট লাভ = (মোট আয় - মোট খরচ) = ৬,৪৩,৫০০.০০ - ৪,৯৮,৪০০.০০ = ১,৪৫,১০০.০০ টাকা।

৪. কৈ মাছ চাষ ও চাষপ্রযুক্তি

ভূমিকা

মিঠা পানির মাছচাষে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম। নদীমাতৃক বাংলাদেশে ২৯৭ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৫০ প্রজাতি হচ্ছে ছোট মাছ। ছোট মাছের মধ্যে কৈ মাছ পুষ্টিগুণ ও স্বাদে অতুলনীয়। বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এ মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। জীবন্ত অবস্থায় কৈ মাছ বাজারজাত করা যায় বিধায় এ মাছের বাজার মূল্য তুলনামূলক বেশি। যে কোন ধরণের জলাশয়ে এমনকি চৌবাচ্চা ও খাঁচাতেও এ মাছ চাষ করা যায়। মৎস্য বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণার মাধ্যমে প্রনোদিত প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি সফলতা লাভ করায় মূল্যবান এ মাছটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

মাছের বৈশিষ্ট্যঃ

এ মাছের মাথা বড় ও প্রায় ত্রিকোনাকৃতি। দেশী কৈ এর বর্ণ কালচে সবুজ বা বাদামি সবুজ। দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা। দুটো চোয়ালেই দাঁত আছে। পৃষ্ঠ ও বক্ষপাখনা ধারালো কাঁটা যুক্ত। কৈ মাছ কানকো দিয়ে শুকনায় চলাফেরা করতে পারে। কানকোর পিছনে কালো ফোটা বিদ্যমান। অতিরিক্ত শ্বসণ অঙ্গের কারণে এরা বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়।

আবাসস্থল ও প্রাকৃতিক প্রজননঃ

কৈ মাছ মুক্ত জলাশয় বা প্লাবনভূমির মাছ। বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত, খাল-বিল, ডোবা নালা ইত্যাদি জলাশয়ে কৈ মাছ দেখা যায়। দেশের সব অঞ্চলে কৈ মাছ দেখা যায়। তবে, গোপালগঞ্জ জেলার চান্দার বিল, মাদারীপুর জেলার বাঘিয়ার বিল, পাবনা, নাটোর ও নওগাঁর চলন বিল কৈ মাছের জন্য বিখ্যাত। অনেক পুরাতন বা মজা পুকুরের ঝোঁপঝাড়, জঙ্গল অথবা কচুরী পানার শিখড়ে ও কাদায় এদের বসবাস। জলাশয়ের নিচের স্তরে এরা বাস করে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে নতুন বৃষ্টি হলে এরা স্রোতের উজানে খাল বিল থেকে উঠে ধানক্ষেতের স্বল্প পানিতে ডিম দেয়। ডিম থেকে রেনু পোনা ১৫-২০ দিনে পরিণত পোনায় উপনীত হয়ে আবার খাল-বিল, ডোবা-নালায় বিস্তার লাভ করে।

খাদ্যাভাসঃ

কৈ মাছ সর্বভূক। জু-প্লাংকটন এর প্রধান খাদ্য। এরা ছোট অবস্থায় অতিক্ষুদ্র জলজ প্রাণী ও কীট পতঙ্গ খায় এবং বড় হলে পতঙ্গ ও তাদের শুককীট, শৈবাল, পোকা মাকড় পঁচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খায়।

অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ

কৈ মাছ পুষ্টি গুণে ভরপুর। প্রতি ১০০ গ্রাম মাছে আমিষের পরিমাণ ১৪.৮ গ্রাম। এরা দ্রুত বর্ধনশীল এবং স্বল্প সময়ে জীবন্ত বাজারজাত করা যায় বলে এ মাছের বাজার মূল্য অধিক ও চাহিদা ব্যাপক। রোগীর পথ্য হিসেবেও এ মাছ অধিক পরিচিত।

দৈহিক বৃদ্ধিঃ কৈ মাছ স্বল্প সময়ে বাজারজাত করা যায়। নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য দিলে ৪-৬ মাসে দেশী কৈ ৫০-৬০ গ্রাম, থাই কৈ ১০০-১২৫ গ্রাম এবং ভিয়েতনামী কৈ ২০০-২৫০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

চাষ ব্যবস্থাপনা

পুকুর নির্বাচনঃ

পুকুর নির্বাচনের উপর কৈ মাছের উৎপাদন ও আয় অনেকাংশে নির্ভরশীল। স্থান, মাটির গুণাগুণ, পুকুরের গভীরতা, আকার আয়তন, তলার প্রকৃতি, পাড়ের ঢাল, কাদার প্রকৃতি ইত্যাদি কৈ মাছ উৎপাদন ও আহরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাফল্যজনকভাবে কৈ মাছ চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরুপ হওয়া ভাল:

- **মাটিঃ** যে কোন মাটির পুকুরে কৈ মাছ চাষ করা যায়, তবে দো-আঁশ মাটি উত্তম।
- **মজুদ পুকুরের আকারঃ** আয়তকার হলে ভাল।
- **জলায়তনঃ** ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ছোট থেকে মাঝারি পুকুর কৈ চাষের জন্য উত্তম।

তলা সমান ও কাদা কম হলে জাল টানা ও মৎস্য আহরণ সহজ হবে।

- পুকুর পাড়ের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বড় গাছপালা না থাকা উত্তম।
- পাড় উঁচু ও শক্ত হলে ভাল এবং পানি নির্গমন ও নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা থাকা উত্তম।

পুকুরের ঢালে (কিনারে) নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় কিছু জলজ আগাছা রাখা যেতে পারে।

পুকুর প্রস্তুতিঃ

- কৈ মাছ চাষের জন্য পুকুর শুকানো উত্তম।
- পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে শতক প্রতি ৩০-৪০ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করে অনাকাঙ্খিত মাছ ও প্রাণী দূর করা।
- কালো কাদা অপসারণ, তলা সমান ও পাড় মেরামত করতে হবে।
  ব্লিচিং পাউডার- শতাংশ প্রতি ১৫-২০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে রোগ জীবাণু নির্মুল।

- **ব্লিচিং পাউডার অবশ্যই গুলে ছিটাতে হবে।**
- **খোলা ব্লিচিং পাউডার ক্রয় ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।**

- **চুন প্রয়োগঃ** কৈ মাছ চাষের জন্য চুন একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রতিটি ধাপে এর প্রয়োগ অনিবার্য। পুকুরের মাটি ও পানির পিএইচ মান এবং রোগের লক্ষণ অনুযায়ী চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পুকুর প্রস্তুতির ধাপে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা হয়।

- **সার প্রয়োগঃ** সাধারণত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (ফাইটোপ্লাংকটন) বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ করা হয়। সার প্রয়োগের অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাথমিক উৎপাদকের (ফাইটোপ্লাংকটন) জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান-নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম (NPK) সরবরাহ করা যা জৈব ও অজৈব উৎস (সার) থেকে পাওয়া যায়। বর্ণিত উপাদানসমূহ শুকনো পুকুরের কাদা থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্ত হয় বিধায় পুকুর শুকানোর পরে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শতাংশ প্রতি ২০০ গ্রাম চালে কুড়া, ১০০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ১ গ্রাম বেকারী ইষ্ট মিশিয়ে ইষ্ট মোলাশিস তৈরী করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, জৈব সারের উৎস হিসেবে গোবর অথবা মুরগীর বিষ্ঠা প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ এগুলি মাছের রোগ বিস্তারের সহায়ক, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের অন্তরায়।

ইষ্ট মোলাশিস প্রস্তুত ও প্রয়োগঃ

একটি পাত্র বা ড্রামে প্রয়োজনীয় চালের কুড়া, চিটা গুড় ও বেকারী ইষ্ট একত্রে মিশিয়ে পানি দিয়ে ডুবিয়ে রাখুন।
২৪ ঘন্টা পর উপরের স্বচ্ছ পানি পুকুরে ঢেলে দিন এবং সমপরিমাণ পানি দিয়ে ড্রাম ভরুন।
পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা পর ড্রামের সমুদয় দ্রব্য (ইষ্ট মোলাশিস) পুকুরে প্রয়োগ করুন।

- পুকুরের চার পার্শ্বে নিরাপত্তা বেষ্টনী/বেড়া/জাল স্থাপন: জৈব নিরাপত্তা এবং কৈ মাছের পলায়নপরতা রোধকল্পে ৩ থেকে ৪ ফুট উঁচু বাঁশের বেড়া অথবা ঘন ফাঁসের জাল স্থাপন করতে হবে।

- পোনা মজুদের ২ দিন পূর্বে শতাংশ প্রতি ৪০০ গ্রাম জিওলাইট ৫ মি.লি. এ্যামোনিয়া গ্যাস নিরোধক দ্রব্য এবং ৩ গ্রাম হারে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। পোনা ছাড়ার ২-৩ ঘণ্টা পূর্বে সোডিয়াম পারকার্বনেট প্রয়োগ করে পানি অক্সিজেন সমৃদ্ধ করা যায়। উল্লেখ্য যে জিওলাইট পুকুরের অর্ধ ঝুলন্ত (Suspended Material) পদার্থের তলানী ফেলে মাছের খাদ্য গ্রহণ সহজ করে।

পোনা সংগ্রহ, পরিবহন ও মজুদঃ সার প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর পোনা মজুদ করা যেতে পারে। স্থানীয় হ্যাচারী/নার্সারী/খামার থেকে সুস্থ সবল উন্নতজাতের পোনা মাছ সংগ্রহ করা যেতে পারে। পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত হ্যাচারী/খামার থেকে পোনা সংগ্রহ করা উত্তম। দুই পরতের পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। একক চাষে ১০০০-১৫০০টি কৈ পোনা অথবা ৮০০টি কৈ এর সাথে ৫০০টি শিং মাছের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। খামারের উৎপাদনশীলতা, চাষির অভিজ্ঞতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং স্থানীয় খামারীদের বর্তমান প্রাকটিস এর ভিত্তিতে শতাংশ প্রতি ০.৫ থেকে ১ গ্রাম ওজনের ৮০০-১০০০টি কৈ মাছের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। কৈ মাছের পোনা মজুদের ১ মাস পর ১০-১৫ গ্রাম ওজনের মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা ১৫-২০টি ছাড়া যেতে পারে। এছাড়াও ৪-৫ ইঞ্চি আকারের সিলভার কার্প এর পোনা ৩-৪টি এবং ২-২.৫ ইঞ্চি আকারের শিং মাছের পোনা ৫০০টি মজুদ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, কৈ মাছ চাষের পুকুরের ফাইটোপ্লাংটন ব্লুম এবং জুপ্লাংটন এর আধিক্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাক্রমে সিলভার কার্প এবং মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা হয়। ব্যয় সমন্বয় করার জন্যও উক্ত প্রজাতির মাছ অবদান রাখে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

কৈ মাছের একক অপেক্ষা মিশ্র চাষ উত্তম, লাভজনক ও ব্যয় স্বাশ্রয়ী।

পানির ভৌত রাসায়নিক গুনাগুণ যেমন পিএইচ তাপমাত্রা অক্সিজেন ইত্যাদির উপর খাদ্য গ্রহণের মাত্রা নির্ভর করে। নিবিড় মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কৈ মাছ চাষে ৩০-৩৫% আমিষ সমৃদ্ধ পিলেট খাদ্য নিম্নের ছক অনুযায়ী সকাল, দুপুর ও বিকেল বেলা প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে খাদ্য সমন্বয় করা যেতে পারে।

কৈ মাছের খাদ্য প্রয়োগের তালিকা (প্রতি শতাংশে):

দিন	দৈহিক ওজন (গ্রাম)	খাদ্য প্রয়োগের হার (%)	খাদ্যের নাম (গ্রাম)	
১-৯	১	২০	নার্সারি-২	● উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি এ্যারেটর/পানির ঝর্ণা দিয়ে অক্সিজেন বাড়িয়ে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া (Digestibility) বৃদ্ধি করুন। অন্যথায় উচ্ছিষ্ট খাদ্যের পচন ক্রিয়ায় মাছ মারা যেতে পারে। ● খাদ্য গুদামের মেঝে শুকনা রাখুন। ● পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখুন। ● খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, তেলাপোকার নাগালের বাহিরে রাখুন।
১০-১৯	৪	১৫	নার্সারি-২	
২০-২৯	৭	১২	নার্সারি-২	
৩০-৩৯	১২	১০	স্টাটার	
৪০-৪৯	২০	৮	স্টাটার	
০-৫৯	২৮	৭	ক্রামবল	
৬০-৬৯	৩৮	৬	ক্রামবল	
৭০-৭৯	৫২	৫	গ্রোয়ার	
৮০-৮৯	৬৫	৪.৫	গ্রোয়ার	
৯০-৯৯	৮০	৪	গ্রোয়ার	
১০০-১২০	১০০	৩.৫	ফিনিসার	

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণঃ কৈ মাছ ৪-৫ মাসের মধ্যে বিক্রয় যোগ্য হয়। সঠিক ঘনত্বে পোনা মজুদ এবং নিয়মিত আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিলে ৪-৫ মাসে দেশী কৈ মাছ ৫০-৬০ গ্রাম, থাই কৈ ১০০-১২৫ গ্রাম এবং ভিয়েতনামী কৈ ২০০-২৫০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। এ সময় জালটেনে অথবা পুকুর শুকিয়ে সমুদয় মাছ ধরা যেতে পারে।

আয় ব্যয়ের হিসাবঃ

৫০ (পঞ্চাশ) শতক পুকুরে কৈ (থাই কৈ) মাছ চাষের (এক ফসল) ব্যয়ের হিসাবঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ/ব্যয়ের খাত	সংখ্যা/পরিমান	একক মুল্য (টাকা)	মোট মুল্য (টাকা)
১.	পুকুর ভাড়া (৬ মাসের জন্য)	৫০ শতক	থোক	১০,০০০.০০
২.	পুকুর সংস্কার/ প্রস্তুতি	৫০ শতক	থোক	২,০০০.০০

৩.	চুন	৫০ কেজি	১৫.০০	৭৫০.০০
৪.	**পোনা-** ক. কৈ মাছের পোনা (০.৫-১ গ্রাম) খ. মনোসেক্স তেলাপিয়া গ. সিলভার কার্প এর পোনা ঘ. শিং মাছের পোনা	৪০,০০০টি ১,০০০টি ২৫০টি ২৫০০০টি	০.৮০ ২.০ ৩.০ ১.৫০	৩২,০০০.০০ ২,০০০.০০ ৭৫০.০০ ৩৭,৫০০.০০
৫.	সম্পূরক খাদ্য (৩৫% প্রোটিন, FCR -১.২)	৪,৬৯২ কেজি	৪৫.০০	২,১১,১৪০.০০
৬.	শ্রমিক মজুরী, জালটানা ইত্যাদি	থোক	থোক	১০,০০০.০০
৭.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৫,০০০.০০
			উপমোট ব্যয়	**৩,১১,১৪০.০০**
			ব্যাংক ঋনের উপর ৮% হারে সুদ	**২৪,৮৯১.০০**
			সর্বমোট ব্যয়	**৩,৩৬,০৩১.০০**

উৎপাদন ও আয়ঃ

পোনা মজুদ (সংখ্যা)	**মৃত্যু হার (আনুমানিক)**	**বেঁচে থাকা মাছের সংখ্যা**	**গড় ওজন (গ্রাম)**	**মোট ওজন (কেজি)**	**একক মুল্য**	**মোট মুল্য (টাকা)**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৈ মাছ- ৪০,০০০টি	২০%	৩২,০০০টি	৮০	২,৫৬০	১৩০.০০	৩,৩২,৮০০.০০
মনোসেক্স তেলাপিয়া- ১,০০০টি	১০%	৯০০ টি	২৫০	২২৫	৮০.০০	১৮,০০০.০০
	১০%	২২৫ টি	৫০০	১১২.৫	৮০.০০	৯,০০০.০০
সিলভার কার্প - ২৫০টি	১০%	২২,৫০০টি	৫০	১১২৫	৪০০.০০	৩,৩৭৫০০.০০
শিং মাছের পোনা- ২৫,০০০টি						
					সর্বমোট মাছ = ৪,০২২ কেজি	**৬,৯৭,০০০.০০**

নীট আয়ঃ আয়- ব্যয়= ৬,৯৭,০০০.০০ - ৩,৩৬,০৩১.০০ = ৩,৬০,৯৬৯.০০ টাকা।

৫. শিং মাছ ও চাষ প্রযুক্তি

ভূমিকা

শিং মাছের পুষ্টিমান

শিং মাছের পুষ্টিগুণ অন্যান্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি এবং খেতে খুবই সুস্বাদু। রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রোগীর পথ্য হিসেবে এ মাছ সমাদৃত। এ মাছের আমিষ সহজ পাচ্য ও কাটা নরম হওয়ায় সহজেই হজম হয় এবং শরীর গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে। বিভিন্ন সমীখ্যায় দেখা গেছে ভিটামিন 'এ' এর অভাবে প্রতি বছর ৩০ হাজারের অধিক শিশু রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়। গ্রামীণ মানুষের শতকরা ৫৭ ভাগ প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'এ' এর অভাবে, ৮৯ ভাগ 'আয়রন' এর অভাবে, ৮০ ভাগ 'ক্যালশিয়ামের' এর অভাবে এবং ৫৩ ভাগ রক্ত শূন্যতায় ভূগছে। এ মাছে উচ্চ মাত্রায় আমিষ, ভিটামিন, ক্যালশিয়াম ও অন্যান্য মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট থাকে। মাছের মধ্যে শিং মাছেই সর্বোচ্চ পরিমাণে ফসফরাস পাওয়া যায়। শিং মাছে আমিষের পরিমাণ ২২.৮%, ক্যালসিয়াম ০.৬৭% এবং ফসফরাস ০.৬৫%।

শিং মাছের সাধারণ জীববিদ্যা

- শিং মাছ এক বছরেই পরিপক্বতা লাভ করে এবং প্রজননক্ষম হয়। স্ত্রী মাছ পুরুষ অপেক্ষা আকারে বড় হয়;
- শিং মাছ বছরে একবার প্রজনন করে। এ মাছের প্রজনন মৌসুম মে থেকে সেপ্টেম্বর তবে জুন-জুলাই মাসে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রজনন করে থাকে;
- এরা প্রাকৃতিক পরিবেশে অগভীর ঝোঁপ-ঝাড় জাতীয় উদ্ভিদযুক্ত এলাকা, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত ইত্যাদি এলাকায় প্রজনন করে;
- এ মাছের নিষিক্ত ডিম আঠালো হয় এবং নিমজ্জিত আগাছা, তৃণ, ডাল-পালা ইত্যাদিতে লেগে থাকে;
- সাধারণতঃ ৪০ থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের একটি শিং মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৮০০০-১০০০০টি।

আবাসস্থল

- শিং মাছের প্রধান আবাসস্থল হচ্ছে খাল-বিল, হাওর-বাওড় ও নিমজ্জিত ধানক্ষেত;
- এ মাছ কর্দমাক্ত মাটির তলায়, গর্তে, নিমজ্জিত গাছের গুড়ির তলায় বা সুড়ুঙ্গে বসবাস করে থাকে;
- শিং মাছ আগাছা, দল, কচুরিপানা, পঁচা লতা-পাতা, ডাল-পালা যুক্ত জলাশয়ে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে;

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- এ মাছের দেহ লম্বা, সামনের দিক নলাকার, পেছনের দিক চাপা, আঁইশবিহীন এবং মাথার অংশ উপর-নিচে চ্যাপ্টা;
- দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামী লাল এবং বড় অবস্থায় ধূসর কালচে;
- মুখে চার জোড়া গোঁফ ও মাথার দুই পাশে বিষাক্ত দুটি কাঁটা থাকে;
- পৃষ্ঠ পাখনা ছোট ও গোলাকৃতি, পায়ু পাখনা বেশ লম্বা, পুচ্ছ পাখনা গোলাকৃতি বিশিষ্ট;
- এ মাছের এক জোড়া অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র রয়েছে, যা দ্বারা প্রতিকুল পরিবেশে বাতাস হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বসন কাজ চালাতে পারে;
- এরা সাধারণত: ২০-৩০ সেমি. লম্বা হয় এবং ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

শিং মাছ নিশাচর (Nocturnal) প্রাণী এরা রাত্রে খাবার গ্রহণের জন্য বিচরণ করে। এ মাছ সর্বভূক, প্রাকৃতিক উৎসে সাধারণত জলাশয়ের তলদেশের খাদ্য খায়। এছাড়া শিং মাছ তাদের জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে তৈরী খাবারও খেয়ে থাকে। তবে তাদের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্য গ্রহণে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

- রেণু পর্যায়ে: ক্ষুদ্র জলজ প্রাণিকণা (জুপ্ল্যাঙ্কটন) ও পোকা-মাকড়, আর্টেমিয়া, টিউবিফেক্স ইত্যাদিও এদের আকর্ষণীয় খাদ্য;
- কিশোর পর্যায়ে: জুপ্ল্যাঙ্কটন ও ক্ষুদ্র জলজ পোকা-মাকড়, আর্টেমিয়া, টিউবিফেক্স ইত্যাদি;
- বয়োপাপ্ত অবস্থায়: জলজ পোকা-মাকড়, বেনথোস, ক্ষুদ্র চিংড়ি ও মাছ, পঁচা জৈব দ্রব্যাদি।

শিং মাছ চাষের সুবিধা

আমাদের দেশেরে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাছের ভূমিকা অপরিসীম। সে কারণে কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি শিং মাছসহ অন্যান্য মাছের বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আরো যে সব কারণে শিং মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- ছোট-বড় সকল জলাশয়ে অধিক ঘনত্বে একক ও মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে এ মাছ চাষ করা যায়;
- অতিরিক্ত শ্বসন অঙ্গ থাকায় এ মাছ বাতাস হতে অক্সিজেন নিয়ে অনেক সময় ধরে বেচে থাকতে পারে;
- এমাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হওয়ায় এর বাজার চাহিদা এবং বাজার মূল্য অনেক বেশি;
- শিং মাছ ৪-৭ মাস চাষে খাবার উপযোগী ও বাজারজাতকরণ করা যায়;
- জীবন্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাজারজাত করা যায় ফলে নিশ্চিতভাবে উত্তম মূল্য পাওয়া যায়;
- মাছটি রাক্ষুসে নয় বলে অন্য প্রজাতি মাছের সাথে মিশ্র চাষ করা যায়।

শিং মাছ চাষের পুকুরের উল্লেখযোগ্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি

গভীরতা: শিং মাছের পানির গভীরতা ১.৫-৩.০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে তবে ২.০ মিটার গভীরতায় শিং মাছ চাষ ভাল হয়;

পানির স্বচ্ছতা: শিং মাছের পুকুরের পানির স্বচ্ছতা ২০-৩০ সে.মি. হতে পারে তবে ২৫ সে.মি. স্বচ্ছতার পানিতে শিং মাছ চাষ ভালো হয়;

তাপমাত্রা: পুকুরের পানির তাপমাত্রা ২৫-৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে শিং মাছ চাষ করা যায় তবে ২৮-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস চাষের জন্য উত্তম;

পিএইচ: পুকুরের পানির পিএইচ ৬.৫.০-৯.০ এর মধ্যে থাকলে শিং মাছ চাষ করা যায়। তবে ৭.৫-৮.৫ মাত্রার পিএইচ চাষের জন্য উত্তম;

খরতা (Hardness): ৮০-২০০ মি.গ্রা/লিটার খরতায় শিং মাছ চাষ করা যায় তবে পানির খরতা ৭০-১০০ মি.গ্রা/লিটার শিং মাছ চাষের জন্য উত্তম;

দ্রবনীয় অক্সিজেন (DO): পুকুরের পানির দ্রবনীয় অক্সিজেন মাত্রা ৩-৮ মি.গ্রা./লি. এ শিং মাছ চাষ করা যায় তবে দ্রবনীয় অক্সিজেন এর মাত্রা ৫ মি.গ্রা./লি. শিং মাছ চাষের জন্য উত্তম;

কার্বন ডাই অক্সাইড(CO2): পুকুরের পানির কার্বন ডাই অক্সাইড মাত্রা ৫-১০ মি.গ্রা./লি. এ শিং মাছ চাষ করা যায় তবে কার্বন ডাই অক্সাইড ৫ মি.গ্রা./লি. শিং মাছ চাষের জন্য উত্তম;

অ্যামোনিয়া (NH3): পুকুরের পানিতে ০.০৫মি.গ্রা./লি. এর বেশী অ্যামোনিয়া থাকলে শিং মাছের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ০.১ মি.গ্রা./লি. এর বেশী অ্যামোনিয়া হলে মাছ মারা যেতে পারে;

নাইট্রাইট নাইট্রোজেন: পানিতে ০.১ মি.গ্রা./লি. এর যত কম হয় তত ভাল;

নাইট্রেড নাইট্রোজেন: পানিতে ২০ মি.গ্রা./লি. এর যত কম হয় তত ভাল;

হাইড্রোজন সালফাইড গ্যাস (H2S): পানিতে ০.০৫ মি.গ্রা./লি. এর যত কম হয় তত ভাল;

আয়রণ: পানিতে ০.২ মি.গ্রা./লি. এর যত কম হয় তত ভাল;

ফসফরাস: পানিতে ০.২ মি.গ্রা./লি. এর যত বেশী হয় তত ভাল;

লবনাক্ততা: পানিতে ৩ পিপিটি এর চেয়ে যত কম লবনাক্ততা থাকবে তত ভাল।

মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুর নির্বাচনের ওপর শিং মাছ চাষের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। লাভজনকভাবে শিং মাছ চাষ করতে হলে পুকুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মাছ চাষের পুকুর নির্বাচনের ন্যায় সাধারণ প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তবে পানির গভীরতা কমে গেলে সূর্যের আলো পুকুরের তলদেশে পৌছিলে শিং মাছ অস্বস্তিতে পড়ে এবং রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এজন্য পুকরের পানির গভীরতা ন্যুনতম ১.৫মিটার হতে হবে এবং প্রয়োজনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। শিং মাছের পুকুরে তলায় কিছুটা কাদা (১০-১৫ সে.মি) থাকা প্রয়োজন তবে অধিক কাদা ভাল নয়। একারণে পুরাতন পুকুরে শিং মাছ চাষ সুবিধাজনক তবে নতুন পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থ বৃদ্ধির জন্য সরিষার খৈল প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটি নরম করে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। শিং মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে পুকুর সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরী। মাছ চাষের সফলতা অনেকাংশে এর ওপর নির্ভর করে। পুকুর সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে হবে:

পাড় মেরামত: পুকরের পাড় এমন উচু করতে হবে যাতে স্বাভাবিক বর্ষায় ডুবে না যায়। পাড় ভাংগা থকলে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। যাতে বাহিরের রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে। পাড়ে গর্ত থাকলে তা ভরে দিতে হবে। যাতে বাহিরের পানি চুঁয়ে পাড় ভেঙ্গে ফেলতে না পারে।

পাড়ের ঢাল মেরামত: পুকুর পাড়ের ঢাল ভাঙ্গা থাকলে বা ঢালের গায়ে গর্ত থাকলে মেরামত করতে হবে তা হলে পাড় সহজে ভাঙ্গবে না। পাড়ের ঢাল ১:২ অনুপাতে রাখা দরকার।

তলার অতিরিক্ত কাদা অপসারণ: পুকুরের তলায় ১০-১৫ সে.মি. এর বেশি কাদা থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে, সহজে হররা টানা যায় না ও অক্সিজেন সমস্যা হতে পারে।

মাছ আহরণের জন্য গভীর অংশ(Fish Catch Pit)তৈরি: শিং মাছ সহজে ধরার জন্য পুকুরের তলদেশ একদিকে ঢালু হতে হবে এবং পুকরের আয়তনের উপর নির্ভর করে (১০ x ১০ বর্গফুট আকারের) যেদিকে পুকুরটি ঢালু সেদিকে একটি তুলনামূলক গভীর অংশ সৃষ্টি করতে হবে।

পাড়ের বড় গাছের ডালপালা ছাটাই: যদি পুকুরের পাড়ে বড় গাছ থাকে এবং পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টি করে তবে, গাছের ডালপালা কেটে ফেলতে হবে।

পুকুর পাড়ের ঝোঁপঝাড় পরিস্কার করা: পুকুর পাড়ের ঝোঁপঝাড় কেটে পরিস্কার করতে হয়। এতে মৎস্যভূক প্রাণী যেখানে সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

পুকুর শুকানো: শিং মাছ চাষ সফলভাবে করার জন্য অবশ্যই পুকুর শুকাতে হবে। পুকুর শুকালে পুকরের তলদেশ উন্নয়ন করা যাবে এবং সকল ধরনের মাছ অপসারণ ঘটবে। পুকুরের তলদেশে জমে থাকা সকল ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস দূর হবে এবং রোগজীবাণু ধবংশ হবে।

ব্লিচিং পাউডার: শিং মাছ চাষে ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে, এ জন্য পুকুর প্রস্তুতির সময় ব্লিচিং পাউডার (৩০% ক্লোরিন) প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে পুকুরের তলদেশ দূষণ মুক্ত করা প্রয়োজন। ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করলে পুকুরে জলজ পরিবেশের বা পুকুরের তলদেশের মাটির সকল ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়াকে ধবংশ করা যায়। পুকুর যদি শুকিয়ে প্রস্তত করা হয় তবে ব্লিচিং না দিলেও চলবে। তবে পুকুর শুকালে তলদেশ চাষ দিয়ে আলগা করে দিতে হবে।

চুন প্রয়োগ: মাছচাষে চুন প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। চুন ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ অজৈব যৌগ যা এসিড মাধ্যমকে ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ করে মাছ চাষের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে।

চুনের মাত্রা: পুকুর প্রস্তুতের সময় পুকুরের বিদ্যমান পিএইচ (Ph) মাত্রার ওপর বা তলদেশের কাদার পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে শতাংশে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুনের কার্যকারীতা ভাল পেতে সাদা চাকা পোড়া চুন (CaO) প্রয়োগ করতে হবে। পাউডার চুন বা কলি চুন (Ca (OH2) এর কার্যকারীতা কম।

চুন প্রয়োগ পদ্ধতি: শুকনা পুকুরের তলায় এবং পুকুরের ঢালে যে পর্যন্ত পানি উঠবে সে পর্যন্ত এবং পুকুরের তলদেশে পানিতে গুলানো চুন ভাল ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এ কাজটি বেলা ১১-১২ টার মধ্যে করতে হবে। মনে রাখতে হবে চুন বেশি সময় ধরে

ভিজিয়ে রাখা যাবে না। এতে চুনের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। পুকুরের তলদেশে কাদা থাকলে মই দিয়ে বা কাঠের মোটা ডাল দিয়ে পকুরের তলদেশ নাড়িয়ে দিতে হবে যাতে চুন কাদার নীচে প্রবেশ করতে পারে।

সার প্রয়োগঃ শিং মাছ চাষে সাধারণত: পুকুরে সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। তবে যেহেতু শিং মাছ সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না সে জন্য অগভীর তথা ৩-৪ ফুট গভীরতার পুকুরের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করে শিং মাছের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। সারের মাত্রা পুকুর ভেদে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ১০০-১৫০ গ্রাম এবং টিএসপি ১০০-১৫০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুরের পানির স্বচ্ছতা কমানোর জন্য বা প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য অনেক চাষি শিং মাছের পাউডার নার্সারি খাবার কিছুটা বেশি মাত্রায় পানিতে গুলে পুকুরে প্রয়োগ করে থাকেন। আবার শতাংশে ২০০-২৫০ গ্রাম হারে সরিষার খৈল ২-৩ দিন ভিজিয়ে জৈব সারে পরিণত করে পুকুরে প্রয়োগ করলে একই ভাবে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হবে।

পুকুরের চারিদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপনঃ শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পুকুরের চারিদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি বা ঘের দেওয়া। সাধারণত: ঘন ফাঁসের নাইলন জাল বা বাঁশের বানা দিয়ে বেড়া তৈরি করা যেতে পারে। বেষ্টনী তৈরি করার প্রধান উদ্দেশ্য হল অবাঞ্চিত মাছ, শিকারী ক্ষতিকর প্রাণী সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল প্রভৃতিসহ অন্যান্য প্রাণীর প্রবেশ বন্ধ করা এবং বর্ষার সময় পরিপক্ক মাছ পাড় বেয়ে বেরিয়া যাওয়া বন্ধ করা। বেস্টনী স্থাপনের জন্য পুকুরের পাড়ের ওপর চতুর্দিকে ৬ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে গর্তের মধ্যে ৮-১০ ফুট পর পর বাঁশের খুটি বা গাছের ডাল শক্ত করে পুতে দিতে হবে। এর পর নাইলনের জাল দিয়ে পুকুর পাড়ের চতুর্দিকে ঘিরে দিতে হবে। পুকুরে পানি প্রবেশের আগে অথবা পানি প্রবেশের সাথে সাথে এ বেষ্টনী তৈরী করতে হবে।

পুকুরের ওপর বড় ফাঁসের জাল স্থাপনঃ শিং মাছ পুকুরে অধিক ঘনত্বে চাষ করা হয় এবং এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল পানির উপরের স্তরে এসে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করা। মাছের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে সহজে শিকারী পাখির নজরে পড়ে। শিকারী পাখির হাত থেকে মাছ রক্ষার জন্য সমস্ত পুকুরের ওপর বড় ফাঁসের জাল স্থাপন করতে হয়। জাল ছাড়াও লম্বা শক্ত সুতা পুকুরে আড়াআড়ি জালের মত টেনে দিয়েও এ উদ্দেশ্য সাধন করা যেতে পারে। অন্যথায় প্রতিদিন শিকারী পাখি অনেক পরিমাণ মাছ খেয়ে ফেলবে এবং মাছ উৎপাদনে নেতিবাচক (Negative) প্রভাব ফেলবে এবং চাষি অধিক লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

মাছ চাষের ধারাবাহিক কার্যক্রমের এ পর্যায়ে লাভজনক চাষ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন

শিং ও মাগুর মাছের পোনা পরিবহন রুই জাতীয় মাছের পোনা পরিবহনের মত হলেও কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এসব মাছ কাটাযুক্ত হওয়ায় বড় আকারের পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। শিং ও মাগুরের ছোট পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহন করা উত্তম। শিং মাছের পোনার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে তা মজুদ পুকুরে স্থানান্তর যোগ্য হয়। গুণগতমানসম্পন্ন পোনা নিশ্চিত করার জন্য পোনার উৎসের বিষয়ে ভালভাবে খোজ খবর নিতে হবে এবং ভাল জাতের সুস্থ-সবল পোনা সংগ্রহ করতে হবে। পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রধানত এলুমিনিয়ামের পাতিল বা প্লাষ্টিকের ড্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময় প্লাষ্টিকের ড্রামে পরিমাণ মত পোনা অর্থাৎ ৫০ লিটার পানিতে ৫০০০ পোনা (৫-৬ ঘন্টা পরিবহনে) নিয়ে ড্রামের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, এক্ষেত্রে ড্রামের মুখের ঢাকনি ছিদ্র করে বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হয়। পোনা ভর্তি ড্রাম দূরে পরিবহনের সময় বাসের লাগেজ রাখার স্থানে রেখে পরিবহন করা যায়। কারণ শিং এবং মাগুর মাছের পোনা পরিবহনের সময় বাড়তি অক্সিজেন বা পানি আলোড়িত করার প্রয়োজন হয় না। পোনার ড্রামে কি পরিমাণ পোনা পরিবহন করা যাবে সেটা নির্ভর করে পোনার আকার এবং কতদূরে পোনা পরিবহন করা হবে তার উপর। অনেক বেশি সময় ধরে পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে পোনার সংখ্যা কমিয়ে নিতে হবে।

শিং মাছের পোনা পরিবহনে সতর্কতা

১) পুকুর থেকে পোনা পরিবহনের আগের দিন পুকুরে কোন খাদ্য দেয়া যাবে না। পোনা পরিবহনের পূর্বে অবশ্যই পোনা টেকসই করে নিতে হবে। এ জন্য পোনা পরিবহনের কয়েক ঘন্টা আগে পানির ফোয়ারা যুক্ত হাউজে রাখতে হবে। এ ভাবে পোনার পেট সম্পূর্ণ খাদ্যমুক্ত করা যায়। এ কাজটি পুকুরে হাপায় রেখেও করা যেতে পারে। পোনার পেট খালি না করলে পরিবহন পাত্রে মল ত্যাগ করে পাত্রের পানি দূষিত করে ফেলে এবং পোনার পরিবহন জনিত ধকল বেড়ে যেতে পারে এবং পোনার মৃত্যু হারও বেড়ে যেতে পারে। পোনা পরিবহনের সময় একই আকারের পোনা পরিবহন করা উত্তম।

২) শিং মাছের পোনা নার্সারি পুকুর থেকে ধরা বা কন্ডিশনিং হাউজ (Cistern) থেকে ধরার সময় বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে কারণ এদের শরীরের ত্বক খুবই পাতলা। এজন্য এ পোনা নাড়া চাড়া (Handling) করার সময় কোন পর্যায়ে প্লাষ্টিকের ছিদ্র যুক্ত ঝাকা ব্যবহার করা যাবে না। এ ধরনের ঝাকা বেশ খস খসে এতে পোনা নাড়া চাড়া (Handling) করলে পোনার শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীতে সেখানে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমিত (Infection) হয়ে পোনার মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। শিং মাছের ক্ষেত্রে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ দ্রুত অন্যান্য মাছে ছড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষত্রে মসৃন নাইলনের হাপা বা ষ্টিলের মসৃন গামলা ব্যবহার সব চেয়ে উত্তম।

৩) পোনা পরিবহনের সময় অধিক ঘনত্ব অবশ্যই পরিহার করতে হবে। পাত্রের পানি পরিবর্তনের সময় ক্রমান্বয়ে নতুন পানি যুক্ত করে পুরাতন পানি ফেলে দিতে হবে।

পোনা টেকসইকরণঃ

শিং মাছের পোনা পুকুরে মজুদের উদ্দেশ্যে পরিবহণের পূর্বেই টেকসই করে নিতে হয়। সরবরাহের উদ্দেশ্যে পোনা ধরার আগের শেষরাত্র থেকে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখা দরকার। আহরণকৃত পোনাগুলো ট্যাংক বা সিস্টার্নে ৮-১২ ঘণ্টা ঝরণাধারায় রেখে টেকসই করা যায়।

মজুদ ঘনত্বঃ

মাছ চাষের সফলতার অন্যতম প্রধান একটি নিয়ামক হচ্ছে মজুদ ঘনত্ব। মজুদ ঘনত্বের ওপর মাছের খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণসহ অনান্য খরচ নির্ভরশীল। তাই অধিক পরিমাণে পোনা মাছ পুকুরে মজুদ করা হলে চাষের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করলে আরো সমস্যা হল প্রদত্ত খাদ্যের FCR (Food Conversion Ratio) এর মান ভাল হয় না। এ ছাড়া জলাশয়ের একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা (Carrying Capacity) থাকে। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মাছ মজুদ করা হলে প্রত্যাশিত মাত্রায় উৎপাদন পাওয়া যাবে না, বহুবিধ সমস্যা দেখা দিবে। মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করে চাষের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ, পোনার আকার, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের ধরণ ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং চাষির মাছ চাষের অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সামর্থের উপর। পুকুরের পানির গভীরতার ওপরও পোনা ছাড়ার মজুদ ঘনত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। পুকুরের গভীরতা ৩-৪ ফুট হলে যে পরিমাণ পোনা ছাড়া যাবে ৫-৬ ফুট হলে তার থেকে বেশি পোনা মাছ ছাড়া যাবে।

পোনা মজুদঃ

মাঠ পর্যায়ে শিং মাছ একক চাষের পাশাপাশি অত্যন্ত সফলভাবে অন্যান্য প্রজাতির মাছের সাথে বিভিন্ন ঘনত্বে চাষ করা হচ্ছে। এখানে শিং মাছ বাণিজ্যিকভাবে চাষে অধিক প্রচলিত কয়েকটি লাভজনক মডেল উল্লেখ করা হল। শিং মাছের পোনার আকার কেজিতে ১৫০০-২৫০০টি হলে চাষের পুকুরে ছাড়া যেতে পারে।

(প্রতি শতাংশে পোনা ছাড়ার সংখ্যা)

প্রজাতির নাম	মডেল ১	মডেল ২	মডেল ৩	মডেল ৪	মডেল ৫	মডেল ৬
শিং	১০০০-১২০০	৮০০-১০০০	৫০০-৮০০	৫০০-৭০০	৭০০-৯০০	৬০০-৮০০
কার্পজাতীয়	৫-৮	-	৫-৮	৫-৮		২০-৪০

মাগুর	-	৫০-১০০	-	-	-	-
তেলাপিয়া	-	১০-৫০	-	-	-	-
পাবদা	-	-	৪০০-৬০০	-	-	-
গুলসা	-	-	-	৫০০-৬০০	-	-
কৈ	-	-	-	-	৫০০-৮০০	-

পোনা অভ্যস্থকরণ

পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও রাসায়নিক গুণাগুণ পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও রাসায়নিক গুণাগুণের পার্থক্য থাকে। এজন্য পোনা পরিবহন পাত্র থেকে পুকুরে ছাড়ার আগে পুকুরের পানির সাথে অভ্যস্থ করে নিতে হবে।

পোনা অবমুক্তকরণ

পোনা ছাড়ার আগে পুকুরের পানিতে তাৎক্ষনিক অক্সিজেন সরবরাহের জন্য সোডিয়াম পারকার্বনেট ৩০ শতকে ০.৫ কেজি হারে পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। এর পাশাপাশি জীবাণু নাশক পরিমাণমত পানিতে ভালভাবে গুলিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিলে পোনার বাঁচার হার ভাল হবে। এ কাজটি পোনা ছাড়ার পরও করা যেতে পারে। পোনা অভ্যস্থ করার পর পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাহিরের থেকে ভিতরের দিকে শ্রতের ব্যবস্থা করলে পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। পোনা পুকুরে ছাড়ার ১২ ঘন্টা পরেও আর একবার সোডিয়াম পারকার্বনেটর ডোজ দেয়া যেতে পারে।

মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

শিং মাছ বা মাছ চাষে অধিক ফলন নিশ্চিত করার জন্য পুকুরে সুষম ভাল মানের সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে। শিং মাছ সাধারণত কিট পতঙ্গ জাতীয় খাবার খেয়ে বড় হয়। সম্পূরক খাবার দিয়ে চাষের জন্য অধিক আমিষ সমৃদ্ধ (৩০% এর অধিক) খাবার সরবরাহ করতে হয়। শিং মাছের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মাত্রার আমিষ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন হয়।

ক) খাদ্য তৈরী: শিং মাছের খাবার দুই ভাবে তৈরি করা যেতে পারে।

i) নিজস্ব খামারে তৈরি: শিং মাছ চাষের জন্য নিজস্ব খামারে বা বাড়িতে সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। নিজস্ব খামারে খাবার তৈরি করে শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে মজুদ ঘনত্ব কিছুটা কম দিতে হবে।

ii)বাণিজ্যিক খাবার: অধিকাংশ চাষি শিং মাছ চাষে বাজার থেকে বিভিন্ন ব্রান্ডের বাণিজ্যিক খাদ্য ব্যবহার করে থাকেন। বাজারে সুষম পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ব্রান্ডের উন্নত মানের শিং মাছের খাদ্য পাওয়া যায়। শিং মাছের বয়সের চাহিদার সাথে, মুখের আকার ও আমিষের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরির খাদ্য রয়েছে। এ ধরনের খাবারের এফসিআর এর মান বেশ ভাল। বাণিজ্যিক খাবার আবার দুই ধরনের: ক) ডুবন্ত ও খ) ভাসমান।

শিং মাছের খাদ্য সাধারণত দিনে দুইবার প্রয়োগ করতে হয়। খুব ভোরে একবার এবং সন্ধার পরে একবার। মোট খাদ্যের ৬০% সন্ধায় এবং ৪০% ভোরে দিতে হবে।

খ) খাদ্য প্রয়োগঃ পুকুরে পোনা মজুদের পর নার্সারি খাবার ০.৫ মিমি. (মাছের ওজনের ২৫-৩০% হারে) পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে। মোট খাবার ভোরে এবং সন্ধায় বিভক্ত করে পুকুরের এক পাড় বরাবর ছিটিয়ে দিতে হবে। বড় পুকুর হলে সকল পাড় বারাবর দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে মাছে খাবার সব খাচ্ছে কি না। সব খাবার না খেলে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১০ থেকে ১৫ দিন পর পোনার আকার বড় হলে ০.৮ মিমি. এর দানাদার ভাসমান নার্সারি খাবার দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে মাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে খাবারের আকারও বড় হবে। মাছের আকারের সথে খাবারের আকার কি হবে তা নিম্নের সারণীতে দেখানো হল:

মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাদ্যের আকার (মিমি)		মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাদ্যের আকার (মিমি)
৮০০-৬০০	০.৫		১০০-৬০	২.০
৬০০-৩০০	০.৮		৬০-৩০	২.৫
৩০০-২০০	১.০		৩০-১৫	৩.০
২০০-১০০	১.৫			

নার্সারি খাবারের পর, প্রি-স্টার্টার, স্টার্টার, গ্রোয়ার এবং শেষে ফিনিসার এভাবে মাছ চাষ চলা কালে ক্রমন্বয়ে খাবার পরিবর্তন করতে হবে। মাছের দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে নিম্নরূপ হারে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাদ্য প্রয়োগের হার (%)		মাছের আকার (প্রতি কেজিতে পোনার সংখ্যা)	খাদ্য প্রয়োগের হার (%)
৩০০০-২০০০	৫০-৪০		১১০-৮০	১৪-১২
২০০০-১২০০	৪০-৩০		৮০-৬০	১২-১০
১২০০-৮০০	৩০-২৫		৬০-৪৫	১০-৮
৮০০-৪৫০	২৫-২০		৪৫-৩৫	৮-৭
৪৫০-৩০০	২০-১৮		৩৫-২৮	৭-৬
৩০০-২২০	১৮-১৬		২৮-২০	৬-৫
২২০-১৬০	১৬-১৫		২০-১৫	৫-৪
১৬০-১১০	১৫-১৪		১৫-১০	৪-৩

গ) নমুনায়ন (Sampling)ও খাবারের পরিমাণ নির্ধারণঃ চাষের মাছের থেকে কিছু মাছ ধরে মাছের গড় ওজন পরিমাপ করে সমস্ত মাছের ওজন (Biomass) বের করে খাবারে পরিমাণ সমন্বয় করতে হয়। এ কাজ শিং মাছের ক্ষেত্রে প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর করা যেতে পারে। সঠিকভাবে নমুনায়নের জন্য মোট মাছের ১০% মাছ ধরে নমুনায়ন করতে হবে এবং মোট ওজন বের করার ক্ষেত্রে

পুকুরে অবমুক্তকৃত মোট মাছের ৯০% বাঁচার পরিমাণ ধরতে হবে। মজুদকৃত মাছ থেকে ৫০-১০০টি মাছ ধরেও নমুনায়ন করা যেতে পারে।

ঘ) খাবার প্রদানের কৌশলঃ নির্ধারিত সমস্ত খাবার একবারে পুকুরে ছিটিয়ে না দিয়ে কয়েক বারে প্রয়োগ করতে হবে এবং খাবার প্রদানে একটু সময় নিয়ে খাবার দিতে হবে। প্রতি বারের খাবার কয়েক ভাগে বিভক্ত করে প্রয়াগ করতে হবে। মাছের খাবার গ্রহণের হার পর্যবেক্ষণ করে পরের খাবার দিতে হবে। আর মাছে সবসময় সমান খাবার খায় না। এজন্য সার্বিকভাবে মাছের খাবার গ্রহণ আচারণ পর্যবেক্ষণ করে খাবার সমন্বয় করতে হবে।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ

ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়মিত খাদ্য এবং পরিচর্যা চালিয়ে গেলে ৪-৬ মাস বয়সে গড়ে মাছের আকার ৭০ গ্রাম হয়ে যাবে। এ আকারের মাছ বাজারজাত করার জন্য উপযুক্ত হয়। মাছ আহরণের আগের দিনে কোন প্রকার খাদ্য প্রয়োগ করা যাবে না। শিং মাছ আহরণ করার উপযুক্ত সময় হলো রাত্রে বেড় জাল দিয়ে টেনে মাছ ধরে হাউজে মজুদ করে রাখা। তবে পূর্ণ আহরণের জন্য পুকুর সেচে সম্পূর্ণ পানি অপসারণ করতে হয়। শিং মাছ বিশাক্ত কাটা ওয়ালা মাছ এজন্য এ মাছ ধরার সময় বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সাধারণত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ সেচার পরে এক হাতে মাছ রাখার পাত্র অন্য হাতে ছোট একটি বাটি দ্বারা মাছ কাদার ভিতর থেকে ধরে হাতে ধরা পাত্রে মজুদ করতে হয়। হাতে ধরা পাত্রটি মসৃন এবং ছিদ্র যুক্ত হওয়া ভাল। শিং মাছের বিষাক্ত কাটার কারণে মাছ সরাসরি হাত দিয়ে ধরা যায় না। মাছ বাটি দ্বারা ধরে প্লাষ্টিকের হাপা বা ব্যারেলে রাখতে হবে। ক্যারেটে বা খসখসে পাত্রে না রাখাই ভাল। আহরিত মাছ বাজার পাঠানোর আগ পর্যন্ত পানির ফোয়ারাযুক্ত হাইজে বা হাপাতে রাখতে হবে। পুকুর থেকে মাছ আহরণ শুরু করলে ২-৩ দিনের ভিতরে শেষ করতে হবে এবং এ সময় কোন প্রকার খাবার ব্যবহার করা উচিৎ হবে না।

শিং মাছের একক চাষের আয় ব্যায়ের নমুনা হিসাব (জলায়তন ৩০ শতাংশ):

ক্র. নং	উপকরণের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট খরচ	মন্তব্য
১.	সংস্কার			১০,০০০.০০	
২.	চুন	৬০ কেজি	২০/-	১২০০.০০	
৩.	টিএসপি	৬ কেজি	২০/-	১২০.০০	
৪.	ইউরিয়া	৬ কেজি	৩০/-	১৮০.০০	
৫.	মাছের পোনা শিং	৩০,০০০টি	১.৫০	৪৫,০০০.০০	কেজিতে ২০০০-২৫০০ আকারের
৬.	কার্প	১৫০টি	৫/-	৭৫০.০০	
৭.	খাদ্য	২৪০০ কেজি	৬৫/-	১,৫৬,০০০.০০	খাদ্যের এফসিআর ২:১ ধরে হিসেব করা হয়েছে
৮.	বিবিধ			২০,০০০.০০	
			মোট খরচ	**২,৩৩,২৫০.০০**	

উৎপাদনঃ শিং মাছ (বাঁচার হার ৭০%, ২০টিতে কেজি) = ১০৫০ কেজি, মোট মূল্য ১০৫০ X ৩৫০ = ৩,৬৭,৫০০.০০
কার্প জাতীয় মাছ (৯০ % বাচার হার) = ১৩৫ কেজি, মোট মূল্য ১৩৫ X ১৫০ = ২০,২৫০.০০

সর্বমোট = ৩,৮৭,৭৫০.০০

নীট লাভঃ (মোট আয় - মোট খরচ) = ৩,৮৭,৭৫০.০০ - ২,৩৩,২৫০.০০ = ১,৫৪,৫০০.০০ টাকা।

৬. পাবদা মাছ ও চাষ প্রযুক্তি

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- পাবদা মাছের দেহ আঁইশবিহীন, চকচকে, উজ্জ্বল রূপালী বর্ণের। দেহের উপরিভাগ ধূসর রূপালী ও পেটের দিক রূপালী বর্ণের;
- মুখ তুলনামূলকভাবে বড়, নিচের চোয়াল বড় ও দাঁতযুক্ত;
- পাবদার দুই জোড়া গোঁফ আছে, এটি ক্যাটফিশ শ্রেণিভুক্ত;
- পৃষ্ঠ-পাখনা ছোট, পায়ু পাখনা তুলনামূলকভাবে লম্বা (পায়ুছিদ্র থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত);
- পার্শ্বীয় রেখা বরাবর স্বর্ণালী বর্ণের ডোরা দাগ দেখা যায়। পুরুষ মাছের পার্শ্বীয় রেখার উপরে ও নিচে খাঁজকাটা দাগগুলো খুবই স্পষ্ট এবং স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে এ দাগগুলো অস্পষ্ট;
- এ মাছের দৈর্ঘ্য পরিপক্ব অবস্থায় ১৫-২৫ সে.মি. হয়, স্ত্রী মাছ একই বয়সী পুরুষ মাছের তুলনায় আকারে বড় হয়ে থাকে;
- পাবদা মাছ এক বছরেই পরিপক্বতা লাভ করে, তবে দুই বছর বয়সী ব্রুড মাছের কৃত্রিম প্রজননে বেশি উপযোগী; এবং
- প্রজনন মৌসুম বেশ দীর্ঘ (ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর), তবে এপ্রিল-আগস্ট এই মাছের সর্বোত্তম প্রজনন মৌসুম।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

- রেণু পোনার খাদ্য: হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম, রটিফেরা গ্রুপের জুও-প্ল্যাংকটন, কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম।
- ধানী থেকে চারা পোনার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, রটিফেরা ও সাইক্লপস গ্রুপের জুও-প্ল্যাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা, মাছের রেনু ও ধানী পোনা, কানপোনা ও দারকিনার পোনা, ইত্যাদি।
- চারা পোনা থেকে বিক্রয় উপযোগি পাবদার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, কুচো চিংড়ি, কেঁচো, জলজ পোকা-মাকড়, শ্যাওলা ও পাতার নরম অংশ।
- পাবদা সর্বভূক, বটম ফিডার (Bottom Feeder), আর্টিফিসিয়াল ফিড দিয়ে বাণিজ্যিক চাষ করা যায়।

পাবদা মাছ চাষের সুবিধা

- ছোট-মাঝারি-বড়, বাৎসরিক/ষান্মাষিক/মৌসুমি ইত্যাদি প্রায় সব ধরণের পুকুরেই চাষ করা যায়;
- একক চাষের পাশাপাশি শিং-গুলশা-টেংরা-কার্পজাতীয় মাছের সাথেও মিশ্রচাষ করা যায়;
- চাহিদা ও বাজারমূল্য বেশি থাকায় এই মাছ চাষে বেশি আয় করা সম্ভব;
- চাষকালীন সময় (Culture Period) সংক্ষিপ্ত। ৪-৬ মাসেই বিক্রয় উপযোগী হয়;
- অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে পরিবহন করে জীবন্ত অবস্থায়ও বাজারজাত করা যায়, ফলে অধিক মুনাফা হয়;
- পোনা ও অন্যান্য চাষ-উপকরণ সহজলভ্য;
- এ দেশের পরিবেশ ও জলবায়ু পাবদা চাষের উপযোগি; এবং
- অবাঞ্চিত মাছের পোনা খেয়ে পুকুর পরিষ্কার রাখে।

পাবদা মাছচাষের পুকুরে উল্লে- খযোগ্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি

- **পিএইচ:** পুকুরের পানির পিএইচ ৭.০-৮.৫ এর মধ্যে থাকলে পাবদা মাছ চাষ করা যায়। তবে ৭.৫-৮.০ মাত্রার পিএইচ পাবদা চাষের জন্য উত্তম।
- **পানির স্বচ্ছতা:** প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতির পরিমাণ ২৫-৩০ সে.মি. স্বচ্ছতার মধ্যে থাকলে ভালো হয়।
- **খরতা**(Hardness): ৮০-২০০ মি.গ্রা/লিটার খরতা পাবদা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। পানির খরতা ২০-৩০ মি.গ্রা/লিটার থাকলে সহজে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হয় না।
- **তাপমাত্রা:** ২৫-৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পাবদা মাছ চাষের জন্য উত্তম।
- **আয়রন:** পানিতে আয়রনের মাত্রা ০-১ পিপিএম এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। পানিতে ১ পিপিএম এর চেয়ে বেশি মাত্রার আয়রন থাকা পাবদা মাছ চাষের জন্য ক্ষতিকর।

মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা

পুকুর প্রস্তুতি

পাবদা, গুলশা, টেংরা, শিং, মাগুর, ইত্যাদি ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। পাবদা মাছ চাষের ক্ষেত্রে নার্সারি পুকুর ও একক/মিশ্রচাষের পুকুর প্রস্তুতির প্রক্রিয়াসমূহ প্রায় একই রকম।

পুকুর প্রস্তুতির ধাপসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

- পুকুর শুকানো, তলদেশের কাদা, জৈব অবশেষ অপসারণ।
- পাড় পরিষ্কার, মেরামত ও সংস্কার।
- পাবদা মাছের পুকুরে ১:২ ঢাল সর্বোত্তম।
- পুকুরের তলা মই দিয়ে সমান করে দেওয়া ভালো।
- পুকুরে পানি ঢুকানো ও বের করে দেওয়ার জন্য ইনলেট ও আউটলেট থাকা উত্তম। পুকুরের তলদেশ সংলগ্ন পানি ও উপরের স্তরে মৃত শ্যাওলাযুক্ত পানি বের করার জন্য পৃথক আউটলেটে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- পুকুরের পাড়ের চারপাশে নাইলন নেটের বেড়া দেওয়া হলে সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ, ইত্যাদি শিকারী সরীসৃপসহ অন্যান্য প্রাণির অবাঞ্চিত অনুপ্রবেশ হ্রাস করা যায়। কাজেই পাবদার পুকুরের চারপাশে নাইলন নেটের বেড়া থাকা উত্তম।
- বাজপাখি, পানকৌড়ি, বক, ইত্যাদি শিকারি পাখির আক্রমণ থেকে পাবদা মাছকে রক্ষা করার জন্য পুকুরের উপরে নেটের ঢাকনি অথবা আড়াআড়িভাবে এক হাত পর পর পাস্টিকের ফিতা স্থাপন করা যেতে পারে।
- পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে রোটেনন প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায়।
- পুকুরে শামুক থাকলে তা দূর করা প্রয়োজন। কেননা শামুক বিভিন্ন রোগের জীবাণুর পোষক হিসাবে কাজ করে এবং পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে ভাগ বসায়।
- **ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ:** শামুক দূর করার জন্য ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হলে পুনরায় পুকুর প্রস্তুতিতে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। যদি কোন পুকুরে শামুক না থাকে তবে পুকুর প্রস্তুতির সময় বিঘা প্রতি ৪-৫ কেজি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ৮-১০ দিন শুকিয়ে রোগ-জীবাণু মুক্ত করা উত্তম।
- **চুন প্রয়োগ:** পুকুরের তলদেশের মাটি ও বিদ্যমান পানির pH অনুসারে চুন দিতে হয়। সাধারণত দোআঁশ ও পলি-দোআঁশ মাটির চেয়ে লাল মাটি, এটেল মাটি, কালচে কাদামাটি অধিক অম্লধর্মী হওয়ায় শেষোক্ত মাটির পুকুরে পূর্বোক্ত মাটির পুকুরের চেয়ে বেশি মাত্রায় চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। মাছচাষের পুকুরে পাথুরে চুন ($CaCO_3$) ব্যবহার করা ভালো। পুকুর প্রস্তুতির সময় ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের ২-৩ দিন পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পাবদা মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির গভীরতা ৪-৬ ফুট হলে ভালো হয়।

- **সার প্রয়োগঃ** খৈল- ২০০-২৫০ গ্রাম/শতাংশ ইউরিয়া- ৫০-১০০ গ্রাম/শতাংশ
  টিএসপি- ৫০-১০০ গ্রাম/শতাংশ এমপি- ২০-২৫ গ্রাম/শতাংশ
- সার প্রয়োগের পরেও যদি পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি না হয় তাহলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহের যে কোন একটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারেঃ

নমুনা-১

প্রয়োজনীয় উপাদান	**মাত্রা**	
চাউলের মিহি কুড়া	২০০ গ্রাম/শতাংশ	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নির্যাসটুকু পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ঐ ছাঁকনিতে থাকা অবশিষ্ট উপাদানগুলো ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে পর পর ৩ দিন প্রয়োগ করলে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হয়।
চিটা গুড়	২০০ গ্রাম/শতাংশ	
ইস্ট	৫ গ্রাম/শতাংশ	

নমুনা-২

প্রয়োজনীয় উপাদান	**মাত্রা**	
সরিষার খৈল	৭০ গ্রাম/শতাংশ	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে রস পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।
চিটাগুড়	৭০ গ্রাম/শতাংশ	

নমুনা-৩

প্রয়োজনীয় উপাদান	**মাত্রা**	
৩৫-৪০% প্রোটিনসমৃদ্ধ নার্সারী-১ ফিড (পাউডার)	৩০০ গ্রাম/শতাংশ	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে রস পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।
চিটাগুড়	২০০ গ্রাম/শতাংশ	

নমুনা-৪

প্রয়োজনীয় উপাদান	**মাত্রা**	
আটা/ময়দা	৫০ গ্রাম/শতাংশ	আটা/ময়দা হালকা সিদ্ধ করে আঠালো অবস্থায় এনে এর সাথে চিটাগুড় মিশিয়ে পানিতে পর পর ৩ দিন প্রয়োগ করতে হবে
চিটাগুড়	১০০ গ্রাম/শতাংশ	

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

পাবদা মাছের ভালো উৎপাদন পাওয়ার জন্য চাষের উদ্দেশ্যে সরাসরি মজুদ পুকুরে পোনা মজুদ না করে পূর্বে যত্নসহকারে নার্সারি পুকুরে প্রতিপালন করে নেওয়া প্রয়োজন।

■সুস্থ-সবল পাবদা মাছের পোনার বৈশিষ্ট্যঃ

* গাত্রোবরণ উজ্জ্বল ও চকচকে, পিঠের দিকে কালচে বর্ণের।
* স্রোতের বিপরীতে ঝাঁক বেঁধে দ্রুত চলাচলে সক্ষম।
* পোনার গা পিচ্ছিল, গায়ে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন থাকবে না।
* লেজ এবং অন্যান্য পাখনা অক্ষত থাকবে।

পোনা পরিবহনঃ

পাবদা মাছের পোনা ড্রামে পরিবহণ করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে চাষির পুকুর পর্যন্ত পোনা পরিবহণ করাই উত্তম। ২-৪ সে.মি. আকারের পোনা অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে (৩৬"×২২"-২৪") ব্যাগ প্রতি ১০০০টি হারে ৪-৬ ঘণ্টার দূরত্বে পরিবহণ করা যায়। পোনার আকার ৪-৫ সে.মি. হলে একই সময়ের দূরত্বে ৫০০টি পোনা একই আকারের ব্যাগে পরিবহণ করা যায়। পাবদার পোনা সাধারণত রাতে পরিবহণ করা ভালো। এ সময় পরিবেশের তাপমাত্রা কম থাকায় পোনার পরিবহণজনিত পীড়ন কম হয়। পলিথিন ব্যাগে ৪-৫ লিটার পানি নিয়ে প্রতি ২০ টি ব্যাগে ১০ গ্রাম অক্সিজেন পাউডার, ১ টি ওরস্যালাইন ও মাল্টিভিটামিন বা ভিটামিন সি ১০ গ্রাম হারে ব্যবহার করলে মাছগুলো সতেজ থাকে।

পোনা টেকসইকরণঃ

পাবদা মাছের পোনা পুকুরে মজুদের উদ্দেশ্যে পরিবহণের পূর্বেই টেকসই করে নিতে হয়। সরবরাহের উদ্দেশ্যে পোনা ধরার আগের শেষরাত থেকে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখা দরকার। আহরণকৃত পোনাগুলো ট্যাংক ও সিস্টার্নে ৮-১২ ঘণ্টা ঝরণার পানির স্রোতে রেখে টেকসই করা যায়।

মজুদ ঘনত্বঃ

পাবদা মাছ চাষের জন্য ৩-৫ সে.মি আকারের বা ১৫০০-২০০০টি/কেজি আকারের পোনা মজুদ করা উত্তম। মজুদকৃত পোনাগুলো প্রায় সম-আকারের হওয়া উত্তম।

মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মডেল-১

কেজিতে পোনার সংখ্যা	খাদ্য প্রয়োগের হার (দেহের ওজনের %)	খাদ্যের ধরন	৩৩ শতাংশে ৪০,০০০ টি মাছের জন্য সম্ভাব্য দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (কেজি)
২০০০-৩০০০	৩০-৩৫%	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার)	৪-৫
১২০০-২০০০	২৫-৩০%	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার)	৬-৭
৪৫০-৮০০	২০-২৫%	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার) + নার্সারি-২ ফিড (০.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১২-১৪

৪৫০-৩০০	২০-১৫	নার্সারি-২ ফিড (০.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৫-১৮
৩০০-২২০	১৫-১২	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৭-২০
২২০-১৬০	১২-১০	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৯-২৩
১৬০-১১০	১০-৮	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট) + স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট)	২২-২৬
১১০-৮০	৮-৭	স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট)	২৬-৩১
৮০-৬০	৭-৬	স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট) + স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৩০-৩৭
৬০-৪৫	৬-৫	স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৩৪-৪২
৪৫-৩০	৫-৪	স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৪০-৪৮

খাদ্য ব্যবস্থাপনা (মডেল-২ ও মডেল-৩)

মডেল-২ ও মডেল-৩ এর ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রায় মডেল-১ এর মতই। তবে যেহেতু কার্প জাতীয় মাছের পরিমাণ মডেল-২ ও মডেল-৩ এ তুলনামূলকভাবে মডেল-১ অপেক্ষা বেশি তাই সেক্ষেত্রে দুপুরে একবার কার্পজাতীয় মাছের দেহের ওজনের ২-৩% হারে ডুবন্ত খাদ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

বাণিজ্যিক খাদ্য ছাড়াও চাষিরা উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করে পাবদা মাছ চাষে ব্যবহার করতে পারেন। নিচে সম্পূরক খাদ্য তৈরির একটি মডেল দেয়া হলো:

উপকরণ	**ব্যবহার মাত্রা (%)**	**সরবরাহকৃত আমিষ (%)**
ফিশ মিল	২০	১২
মিট এন্ড বোন মিল	১৫	৭.৫
সয়াবিন মিল	১৫	৬
সরিষার/তিলের খৈল	১৫	৫.২৫
চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	৩০	৩.৬
আটা (গম)	৪.৮	০.৬
ভিটামিন ও খনিজ	০.২	-
	১০০	৩৫

সার ব্যবস্থাপনা:চাষের পুকুরে পানির স্বচ্ছতা ২০-২৫ সে.মি. এর বেশি থাকলে ও প্রাকৃতিক খাবারের উপস্থিতি কম থাকলে সাময়িকভাবে প্রতি শতাংশে ৭০ গ্রাম খৈল, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫ গ্রাম টিএসপি ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে একদিন পর পর মোট তিনবার প্রয়োগ করলে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য আসবে। তবে প্রথম বার সার প্রয়োগের পর পানি বাদামী-সবুজ বর্ণ ধারণ করলে পরবর্তীতে সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

পানি ব্যবস্থাপনা:

- পাবদা মাছের চাষের ক্ষেত্রে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ বজায় রাখা জরুরি। পুকুরের পরিবেশ ভালো রাখার জন্য নিয়মিত পানি পরিবর্তন করা দরকার।
- পানিতে এমোনিয়া গ্যাসের প্রাদুর্ভাব (>০.০২৫ mg/L) পরিলক্ষিত হলে বা অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস (H2S, CH4, CO2 ইত্যাদি) বৃদ্ধি পেলে ইউকা প্ল্যান্ট এক্সট্রাক্ট সমৃদ্ধ গ্যাসনিবারক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রয়োগমাত্রা ৩-৪ মি.লি/শতাংশ/৩-৪ ফুট গভীরতা। ইউকা প্ল্যান্ট এক্সট্রাক্ট বাজারে সহজলভ্য না হলে ইউকা সমৃদ্ধ জিওলাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। জিওলাইটের প্রয়োগমাত্রা ২৩০-২৫০ গ্রাম/শতাংশ/৩-৪ গভীরতা।
- দ্রবীভূত অক্সিজেন ৫ পিপিএম এর চেয়ে কম থাকলে মাছের সাধারণ বৃদ্ধি ও খাদ্য গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে। দ্রবীভূত অক্সিজেন ৩ পিপিএম এর নিচে নেমে এলে পাবদা মারা যেতে পারে। দ্রবীভূত অক্সিজেন বৃদ্ধির জন্য প্রতি ৩৩ শতাংশে ০.৫ কেজি অক্সিজেন পাউডার পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- তলদেশের জৈব পচনের জন্য যদি অক্সিজেন ঘাটতি হয় অথবা পানি ঘোলা হয়ে যায় তাহলে ইউকা সমৃদ্ধ জিওলাইট ২৫০ গ্রাম/শতাংশ হারে ব্যবহার করা যায়।
- পানিতে ফাইটোপ্লাংকটনিক ব্লুম নিয়ন্ত্রণে গাজনকৃত সামুদ্রিক আগাছার নির্যাস (Farmented biomass of seaweed extract) ব্যবহার করা যায়। ৩-৪ ফুট গভীর পানির জন্য প্রয়োগমাত্রা একর প্রতি ৩-৪ কেজি।
- পানির গুণাগুণ রক্ষায় প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রো-বায়োটিক উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা যায়। উপযুক্ত প্রো-বায়োটিক ব্যবহারের মাধ্যমে পানির এমোনিয়া, তলানির জৈব পচনজনিত গ্যাস, টিডিএস, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে পানির পরিবেশ চাষ-উপযোগী রাখা যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ

- সাধারণত ৪-৬ মাসে ৩০-৩৫টি পাবদা মাছে ১ কেজি হয়। এ আকারের পাবদা মাছ বাজারজাত করা যায়।
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করলে পাবদা মাছের বাজারমূল্য বেশি পাওয়া যায়।
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করার জন্য পাবদা মাছ আহরণের পর হাউজ বা ট্যাংকে ৮-১২ ঘণ্টা পানির ধারায় রাখতে হয়।
- অক্সিজেনযুক্ত পলিথিন ব্যাগে (৩৬"×২৪") ১.০ কেজি পর্যন্ত জীবন্ত মাছ ৩-৬ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানের দূরত্বে পরিবহণ করা যায়।
- পলিথিন ব্যাগে ৪-৫ লিটার পানি নিয়ে প্রতি ব্যাগে ০.৫ গ্রাম অক্সিজেন পাউডার ও ১.০ গ্রাম ওরস্যালাইন ব্যবহার করলে মাছগুলো সতেজ থাকে।

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব

৩৩ শতাংশ পুকুরে পাবদা চাষের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়:

১.	পুকুর সেচ ও সংস্কার:	২,০০০.০০
২.	তলার কাদা অপসারণ ও পাড় মেরামত:	২,০০০.০০
৩.	পাড়ে নাইলন নেটের বেড়া ও প্লাস্টিক ফিতা বাবদ ব্যয়:	২,০০০.০০

৪.	চুন, ব্লিচিং পাউডার ও অন্যান্য:	১,০০০.০০
●	পোনা ক্রয়- ৪০,০০০ টি পোনা (পরিবহনসহ):	৪০,০০০.০০
●	খাদ্য বাবদ ব্যয় (৪০,০০০ টি মাছের হিসাবে):	১,৪৮,০০০.০০
●	পানি ব্যবস্থাপনা বাবদ ব্যয়:	৭,০০০.০০
●	ঔষধ ও অন্যান্য বাবদ ব্যয়:	৮,০০০.০০
●	আহরণ ও বাজারজাতকরণ বাবদ ব্যয়:	১০,০০০.০০
	সর্বমোট ব্যয়ঃ	**২,২০,০০০.০০**

৩৩ শতাংশ পুকুরে ৪০,০০০ টি মাছ চাষ থেকে সম্ভাব্য আয়:

মোট উৎপাদন: মডেল-১ অনুযায়ী ৪০,০০০ টি পাবদা মাছের ১০% মৃত্যুহার বিবেচনা করলে ৩৬,০০০ টি মাছ ৩৫ টায় কেজি হিসাবে মোট উৎপাদন হয় প্রায় ১০২৮ কেজি। রুই ও কাতলা মাছের মোট উৎপাদন ৭×৩৩×১ = ২৩১ কেজি।

মোট আয়- প্রতি কেজি পাবদা ৩৫০.০০ দরে ১০২৮ কেজির মূল্য-	৩,৫৯,৮০০.০০
প্রতি কেজি রুই-কাতলা ১৮০.০০ দরে ২৩১ কেজির মূল্য-	৪১,৫৮০.০০
সর্বমোট আয়ঃ	**৪,০১,৩৮০.০০**
মুনাফাঃ	**১,৮১,৩৮০.০০**

৭. গুলশা মাছ ও চাষ প্রযুক্তি

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- গুলশা মাছের দেহ আঁইশ-বিহীন, চকচকে, উজ্জ্বল রূপালী বর্ণের;
- দেহ মধ্যম আকৃতির চাপানো ও পিঠের অংশ বাঁকানো;
- মুখ তুলনামূলকভাবে ছোট, উপরের চোয়াল সামান্য বড়;
- গুলশা ক্যাটফিশ শ্রেণির মাছ, এর চার জোড়া গোঁফ আছে;
- পৃষ্ঠপাখনা ও বক্ষপাখনা লম্বা কাঁটাযুক্ত;
- পৃষ্ঠপাখনা থেকে লেজ পর্যন্ত নরম মাংসল পৃষ্ঠপাখনা (adipose fin) রয়েছে এবং এর লেজ দুই ভাগে বিভক্ত;
- পরিপক্ক অবস্থায় গুলশার দৈর্ঘ্য ১৫-২৩ সে.মি.। স্ত্রী মাছ একই বয়সী পুরুষ মাছের তুলনায় আকারে বড়;
- গুলশা মাছ সর্বভূক; এবং
- গুলশা মাছের প্রজনন মৌসুম বেশ দীর্ঘ (মধ্য ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর), তবে এপ্রিল-আগস্ট মাস এই মাছের প্রজননের সর্বোত্তম মৌসুম।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

- রেণু পোনার খাদ্য: হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম, রটিফেরা গ্রুপের জুও-প্লাংকটন, কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম;
- ধানী থেকে চারা পোনার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, রটিফেরা ও সাইক্লপস গ্রুপের জুও- প্লাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা, কীট-পতঙ্গ, ইত্যাদি;
- চারা পোনা থেকে বিক্রয় উপযোগি গুলশার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, কুচোচিংড়ি, কেঁচো, জলজ পোকা-মাকড়, শ্যাওলা ও পাতার নরম অংশ;

- গুলশা সবর্ভূক, বটম ফিডার (Bottom Feeder) । আর্টিফিসিয়াল ফিড দিয়ে বাণিজ্যিক চাষ করা যায় যদিও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে এরা সরিষার খৈল, চালের কুড়া, ফিসমিল খায় ।

গুলশা মাছ চাষের সুবিধা

- গুলশা মাছ ছোট-মাঝারি-বড় বাৎসরিক/ষান্মাষিক/মৌসুমি ইত্যাদি প্রায় সব ধরনের পুকুরেই চাষ করা যায়;
- একক চাষের পাশাপাশি শিং-পাবদা-টেংরা-কার্পজাতীয় মাছের সাথেও মিশ্রচাষ করা যায়;
- চাহিদা ও বাজারমূল্য বেশি থাকায় এই মাছ চাষে বেশি আয় করা সম্ভব;
- চাষকালীন সময় (Culture Period) ছোট, ৪-৬ মাসেই বিক্রয় উপযোগী হয়; এবং
- অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে পরিবহণ করে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায় ফলে অধিক মুনাফা হয় ।

গুলশা মাছ চাষের অসুবিধা

- সময়মত গুণগতমানের সঠিক আকারের পোনা না পাওয়া ।
- গুলশা চাষ করতে অধিক মাত্রায় অক্সিজেন (৫-৭ মি.লি. গ্রাম/লিটার হারে) চাষের পুকুরে প্রয়োজন ।
- অধিক ঘনত্বে চাষ করার ক্ষেত্রে এ্যারেটর/প্যাডেল হুইলের ব্যবস্থা রাখতে হয় । পুকুর পাড়ে বিদ্যুৎ বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হয়, যা প্রান্তিক চাষিদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য ।
- গুলশা মাছকে রাত্রে খাবার প্রয়োগ করতে হয় । পোনা এবং মাছ পর্যবেক্ষণও রাত্রে করতে হয় যা চাষির জন্য অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক ।

গুলশা মাছ চাষের পুকুরে উল্লেখযোগ্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি

- **পিএইচ:** পুকুরের পানির পিএইচ ৭.০-৮.৫ এর মধ্যে থাকলে গুলশা মাছ চাষ করা যায় । তবে ৭.৫-৮.০ মাত্রার পিএইচ গুলশা চাষের জন্য উত্তম ।
- **পানির স্বচ্ছতা:** ২৪-২৬ সে.মি. স্বচ্ছতার পানিতে গুলশা উৎপাদন ভালো হয় ।
- **খরতা**(Hardness): ৮০-২০০ মি.গ্রা/লিটার খরতা গুলশা উৎপাদনের জন্য উপযোগী । পানির Hardness ২০-৩০ মি.গ্রা/লিটার থাকলে সহজে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কম হয় ।
- **তাপমাত্রা:** ২৫-৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা গুলশা মাছ চাষের জন্য উত্তম ।
- **আয়রণ:** পানিতে আয়রনের মাত্রা ০-১ পিপিএম এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন । পানিতে ১ পিপিএম এর চেয়ে বেশি মাত্রার আয়রণ থাকা গুলশা মাছ চাষের জন্য ক্ষতিকর ।

মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা

পুকুর প্রস্তুতি

গুলশা, ট্যাংরা, পাবদা, শিং, মাগুর ইত্যাদি ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে । গুলশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে নার্সারি পুকুর ও চাষের পুকুর প্রস্তুতির প্রক্রিয়াসমূহ প্রায় একই রকম । প্রস্তুতির ধাপসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

- পুকুর শুকানো, তলদেশের কাদা, জৈব অবশেষ অপসারণ ।
- পাড় পরিষ্কার, মেরামত ও সংস্কার ।
- গুলশা মাছের পুকুরে ১:২ ঢাল সর্বোত্তম ।
- পুকুরের তলা মই দিয়ে সমান করে দেওয়া ভাল ।

- পুকুরে পানি ঢুকানো ও বের করে দেওয়ার জন্য ইনলেট ও আউটলেট থাকা উত্তম ।
- পুকুরের পাড়ের চারপাশে নাইলন নেটের বেড়া দিয়ে সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ, ইত্যাদি শিকারী সরীসৃপসহ অন্যান্য প্রাণির

  অবাঞ্চিত অনুপ্রবেশ হ্রাস করা যায় । কাজেই গুলশা মাছের পুকুরের চারপাশে নাইলন নেটের বেড়া থাকা উত্তম ।
- বাজ, পানকৌড়ি, বক, ইত্যাদি শিকারী পাখির আক্রমণ থেকে গুলশা মাছকে রক্ষা করার জন্য পুকুরের উপরে নেটের ঢাকনি অথবা আড়াআড়িভাবে এক হাত পর পর প্লাস্টিকের ফিতা স্থাপন করা যেতে পারে ।
- পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে রোটেনন প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায় ।
- পুকুরে শামুক থাকলে তা দূর করা প্রয়োজন । কেননা শামুক বিভিন্ন রোগের জীবাণুর পোষক হিসাবে কাজ করে এবং পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে ভাগ বসায় ।
- **ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগঃ** শামুক দূর করার জন্য ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হলে পূনরায় পুকুর প্রস্তুতিতে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের প্রয়োজন নাই । যদি কোন পুকুরে শামুক না থাকে তবে পুকুর প্রস্তুতির সময় প্রতি ৩৩ শতাংশে ৪-৫ কেজি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ৮-১০ দিন শুকিয়ে রোগ-জীবাণু মুক্ত করা উত্তম ।
- **চুন প্রয়োগঃ** পুকুরের তলদেশের মাটি ও বিদ্যমান পানির অনুসারে চুন দিতে হয় । সাধারণত দো-আঁশ ও পলি-দো-আঁশ মাটির চেয়ে লাল মাটি, এটেল মাটি, কালচে কাদামাটি অধিক অম্লধর্মী হয় । অম্লধর্মী মাটির পুকুরে অধিক মাত্রায় চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় । মাছ চাষের পুকুরে পাথুরে চুন ($CaCO_3$) ব্যবহার করা ভালো । পুকুর প্রস্তুতির সময় ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের ২-৩ দিন পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে ।
- গুলশা মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির গভীরতা ৪-৬ ফুট হলে ভালো হয় ।
- **সার প্রয়োগঃ** খৈল : ১৫০-২০০ গ্রাম/শতাংশ ইউরিয়া : ৫০-৭০ গ্রাম/শতাংশ
  টিএসপি : ৫০-৭০ গ্রাম/শতাংশ এমপি : ২০-২৫ গ্রাম/শতাংশ
- গুলশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না । যদি পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় তখন নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে প্রকৃতিক খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে:

নমুনা-১

প্রয়োজনীয় উপাদান	**মাত্রা**	
চাউলের মিহি কুড়া	২০০ গ্রাম/শতাংশ	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নির্যাসটুকু পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে । ঐ ছাকনিতে থাকা অবশিষ্ট উপাদানগুলো ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে । এভাবে পর পর ৩ দিন প্রয়োগ করলে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হয় ।
চিটাগুড়	২০০ গ্রাম/শতাংশ	
ইস্ট	৫-১০ গ্রাম/শতাংশ	

নমুনা-২

প্রয়োজনীয় উপাদান	**মাত্রা**	
সরিষার খৈল	৭০ গ্রাম/শতাংশ	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে রস পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে ।
চিটাগুড়	৭০ গ্রাম/শতাংশ	
ইস্ট	৫-১০ গ্রাম/শতাংশ	

নমুনা-৩

প্রয়োজনীয় উপাদান	মাত্রা	
৩৫-৪০% প্রোটিনসমৃদ্ধ	৩০০ গ্রাম/শতাংশ	একত্রে ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে রস পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।
নার্সারি-১ ফিড (পাউডার)		

নমুনা-৪

প্রয়োজনীয় উপাদান	মাত্রা	
আটা/ময়দা	৫০ গ্রাম/শতাংশ	আটা/ময়দা হালকা সিদ্ধ করে আঠালো অবস্থায় এনে এর সাথে পানি মিশিয়ে পুকুরে পর পর ৩ দিন প্রয়োগ করতে হবে

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

সুস্থ্য-সবল গুলশা মাছের পোনার বৈশিষ্ট্যঃ

- গাত্রবরণ উজ্জ্বল ও চকচকে, পিঠের দিকে কালচে বর্ণের;
- স্রোতের বিপরীতে ঝাঁক বেঁধে দ্রুত চলাচলে সক্ষম;
- পোনার গা পিচ্ছিল, লেজ, বক্ষপাখনার কাঁটা ও অন্যান্য পাখনা অক্ষত থাকবে; এবং
- গায়ে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন থাকবে না;

পোনা পরিবহনঃ

গুলশা মাছের পোনা ড্রামে পরিবহণ করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে চাষির পুকুর পর্যন্ত পোনা পরিবহণ করাই উত্তম। ২-৪ সে.মি. আকারের পোনা অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগে (৩৬"×২২"-২৪") ব্যাগ প্রতি ১০০০টি হারে ৪-৬ ঘণ্টার দূরত্বে পরিবহণ করা যায়। পোনার আকার ৪-৫ সে.মি. হলে একই সময়ের দূরত্বে ৫০০টি পোনা একই আকারের ব্যাগে পরিবহণ করা যায়। গুলশার পোনা সাধারণত রাতে পরিবহণ করা ভালো। এ সময় পরিবেশের তাপমাত্রা কম থাকায় পোনার পরিবহণজনিত পীড়ন কম হয়। পলিথিন ব্যাগে ৪-৫ লিটার পানি নিয়ে প্রতি ২০ টি ব্যাগে ১০ গ্রাম অক্সিজেন পাউডার, ১ টি ওরস্যালাইন ও মাল্টিভিটামিন বা ভিটামিন সি ১০ গ্রাম হারে ব্যবহার করলে মাছগুলো সতেজ থাকে।

পোনা টেকসইকরণ

গুলশা মাছের পোনা পুকুরে মজুদের উদ্দেশ্যে পরিবহণের পূর্বেই টেকসই করে নিতে হয়। সরবরাহের উদ্দেশ্যে পোনা ধরার আগের শেষরাত্র থেকে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখা দরকার। আহরণকৃত পোনাগুলো ট্যাংক বা সিস্টার্নে ৮-১২ ঘণ্টা ঝরণাধারায় রেখে টেকসই করা যায়।

মজুদ ঘনত্ব

গুলশা মাছ চাষের জন্য ৩-৫ সে.মি. আকারের বা ১৫০০-২০০০টি/কেজি আকারের পোনা মজুদ করা উত্তম। মজুদকৃত পোনাগুলো প্রায় সম-আকারের হওয়া উত্তম।

গুলশা মাছের পোনার মজুদ ঘনত্ব (প্রতি শতাংশে)

প্রজাতি	মডেল-১ (সংখ্যা)	মডেল-২ (সংখ্যা)	মডেল-৩ (সংখ্যা)	মডেল-৪ (সংখ্যা)
গুলশা	১০০০-১২০০	৬০০-৭০০	৭০০-৮০০	৭০০-৮০০
পাবদা	-	৩০০-৪০০	-	২০০-২৫০

রুই	৩-৫	৮-১০	৮-১০	৮-১০
কাতলা	১-২	২-৩	২-৩	৫-৮
শিং	-	১৫০-২০০	৩০০-৪০০	১০০-২০০
টেংরা	৫০-১০০	-	-	-
মোট=	**১০৫৪-১৩০৭**	**১০৬০-১৩১৩**	**১০১০-১২১৩**	**১০১৩-১২৬৮**

মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মডেল-১

কেজিতে পোনার সংখ্যা	খাদ্য প্রয়োগের হার (দেহের ওজনের শতকরা)	খাদ্যের ধরণ	৩৩ শতাংশে ৩৩,০০০-৪০,০০০ টি মাছের জন্য সম্ভাব্য দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (কেজি)
২০০০-২৫০০	৩০-৩৫	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার)	৪.৫-৫.৫
১৫০০-২০০০	২৫-৩০	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার)	৬-৭
৪৫০-৮০০	২০-২৫	উন্নত নার্সারি ফিড (পাউডার) + নার্সারি-২ ফিড (০.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১২-১৪
৪৫০-৩০০	২০-১৫	নার্সারি-২ ফিড (০.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৫-১৮
৩০০-২২০	১৫-১২	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৭-২০
২২০-১৬০	১২-১০	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট)	১৯-২৩
১৬০-১১০	১০-৮	স্টার্টার-১ (০.৮মি.মি. ভাসমান পিলেট) + স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট)	২২-২৬
১১০-৮০	৮-৭	স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট)	২৬-৩১
৮০-৬০	৭-৬	স্টার্টার-১ (১.০মি.মি. ভাসমান পিলেট) +	৩০-৩৭
৬০-৪৫	৬-৫	স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৩৪-৪২
৪৫-৩০	৫-৪	স্টার্টার-১ (১.৫মি.মি. ভাসমান পিলেট)	৪০-৪৮

খাদ্য ব্যবস্থাপনা (মডেল-২, মডেল-৩ ও মডেল-৪)

মডেল-২, মডেল-৩ ও মডেল-৪ এর ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রায় মডেল-১ এর মতই। তবে যেহেতু কার্প জাতীয় মাছের পরিমাণ মডেল-২, মডেল-৩ ও মডেল-৪ এ তুলনামূলকভাবে মডেল-১ অপেক্ষা বেশি তাই সেক্ষেত্রে দুপুরে একবার কার্পজাতীয় মাছের দেহের ওজনের ২-৩% হারে ডুবন্ত খাদ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

বাণিজ্যিক খাদ্য ছাড়াও চাষিবৃন্দ উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করে গুলশা মাছ চাষে ব্যবহার করতে পারেন। সম্পূরক খাদ্য তৈরির মডেল পাবদা মাছচাষ অংশে দ্রষ্টব্য।

সার ব্যবস্থাপনা

গুলশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির জন্য সার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কারণ সার ব্যবহারের কোন কারণে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটন ব্লুম সৃষ্টি হলে বা পুকুরে পানির স্বচ্ছতা ১৫-২০ সে.মি. তে থাকলে গুলশা চাষের ক্ষেত্রে অক্সিজেন স্বল্পতা পরিলক্ষিত হতে পারে।

পানি ব্যবস্থাপনাঃ পাবদা মাছচাষ অংশে পানি ব্যবস্থাপনা দ্রষ্টব্য।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ

- গুলশা মাছ সাধারণত ৪-৬ মাসে কেজিতে ৩৫-৪০ টি পর্যন্ত হয়ে যায়। এই সময়েই গুলশা মাছ বাজারজাত করা যায়।
- গুলশা মাছ জাল টেনে আহরণ করে পুরোপুরি ধরা যায় না। জাল টেনে মাছ কমানোর পর পুকুর সেচে আহরণ করতে হয়।
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করলে গুলশা মাছের বাজারমূল্য বেশি পাওয়া যায়।
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করার জন্য গুলশা মাছ আহরণের পর হাউজ বা ট্যাংকে ৮-১২ ঘণ্টা পানির ঝরণাধারায় রাখতে হয়।
- ১৬"×৩০" আকারের অক্সিজেনযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগে ৩৫-৪০ টি/কেজি আকারের গুলশা মাছ ব্যাগ প্রতি ১ কেজি হারে ৬-৭ ঘণ্টা জীবন্ত পরিবহণ করা যায়।

৮. মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা

লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য ভাল জাতের এবং বড় আকারের মানসম্পন্ন পোনা পাওয়া খুবই প্রয়োজন। সময়মত কাঙ্ক্ষিত আকারের পোনা না পাওয়ার জন্য অনেক মৎস্যচাষি ঈপ্সিত উৎপাদন লাভে সমর্থ হয় না। ফলে দেশে সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো উন্নত নার্সারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সঠিক সময়ে ভাল জাতের মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন। প্রধান প্রধান মাছের পেনা উৎপাদন কৌশল এ অংশে আলোচনা করা হলো।

৮.১ রুই-জাতীয় মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা

স্থান নির্বাচন

মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য পুকুরের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাটির বৈশিষ্ট্য সাধারণ মাছ চাষের পুকুরের মতই। এছাড়া আরো যে সব বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো পুকুর খননের এলাকা হবে বন্যামুক্ত ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

রুই জাতীয় মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনায় সাধারণত দুই ধরণের পুকুর ব্যবহার করা হয়।

ক. নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর

যে পুকুরে রেণু ছেড়ে ধানী পর্যন্ত বড় করা হয়, তাকে নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর বলে। এ ধরনের পুকুর সাধারণত ছোট থেকে মাঝারি আকারের হয়ে থাকে। পুকুরের গভীরতাও থাকে তুলনামূলকভাবে কম। কাজেই যে সমস্ত ছোট, মাঝারি ও অগভীর পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনার আকার পর্যন্ত বড় করা হয়, সেগুলো আঁতুড় পুকুর নামে অভিহিত। এ পুকুরের আয়তন সাধারণত ১০-২৫ শতাংশ এবং পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট হয়ে থাকে। তবে প্রজাতিভেদে আয়তন ও গভীরতার তারতম্য ঘটে থাকে। থাই সরপুঁটি মাছে রেণুর ক্ষেত্রে পানির গভীরতা ২-৩ ফুট হলেই ভাল হয়।

খ. লালন বা চারা পুকুর

যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা পোনা (৫-১০সেমি) পর্যন্ত বড় করা হয়, তাকে লালন বা চারা পুকুর বলে। বিভিন্ন ধরনের অগভীর বাৎসরিক পুকুর বা চাষাবাদ মৌসুমে পানির ব্যবস্থা থাকে, এমন ধরনের পুকুরে মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়। নার্সারি পুকুর এবং লালন পুকুরের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- ❖ পুকুরের পাড় উঁচু, মজবুত ও বন্যামুক্ত;
- ❖ পুকুরে পযাপ্ত সূর্যের আলো এবং বাতাস লাগার ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- ❖ নার্সারি পুকুরের আয়তন হবে ১০-৫০ শতাংশ এবং পানির গড় গভীরতা হবে ১.০-১.৫ মিটার;
- ❖ লালন পুকুরের আয়তন হবে ২০-১০০ শতাংশ এবং পানির গড় গভীরতা ১.৫-২.০ মিটার হলে ভাল হয়;
- ❖ উভয় প্রকার পুকুর হবে আয়তাকার যাতে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়;
- ❖ পুকুরের তলায় ১০-১৫ সেমি-এর বেশি কাদা থাকবে না।

তবে একই পুকুরে একধাপ পদ্ধতিতেও রুই জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন করা হয়।

ব্যবস্থাপনা:

১. জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ, ২. রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ, ৩. পুকুর মেরামত ও চাষ দেয়া, ৪. চুন প্রয়োগ বিষয়ে সাধারণ মাছচাষ অংশে অলোচিত হয়েছে।

৫. পুকুরে পানি ভরাটকরণ: পুকুর শুকানো হলে চুন প্রয়োগের ২-৩ দিন পর পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানি সরবরাহ কালে যেন কোনো রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত মাছ ঢুকতে না পারে।

৬. পোনা প্রাপ্তি নির্ধারণ: পুকুরে সার প্রয়োগের ৩-৮ দিনের মধ্যে ফাইটোপ্লাংকটন, ৫-১০ দিনের মধ্যে রটিফার, ৮-১৪ দিনের মধ্যে ক্লাডোসেরা এবং ১২-২০ দিনের মধ্যে কপিপডের উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় থাকে। রেণুর জন্য যেহেতু রটিফার জাতীয় খাদ্য দরকার। তাই রেণু প্রাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ জেনে পুকুরে সার প্রয়োগ করলে পোনার উৎপাদন সবচেয়ে ভালো পাওয়া যাবে।

৭. সার প্রয়োগ: পুকুরের নিজস্ব উৎপাদনশীলতার ওপর সার প্রয়োগের মাত্রা পুকুর থেকে পুকুরে ভিন্ন হয়। পুকুর প্রস্তুতকালীন সার ব্যবহারের মাত্রা নিম্নরূপ:

ইউরিয়া	●	১০০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ
টিএসপি	●	৫০-৭৫ গ্রাম/শতাংশ

পুকুরে পানির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে সার প্রয়োগের মাত্রা কম-বেশি হতে পারে। সার হিসেবে খৈলও ব্যবহার করা যেতে পারে। শতাংশ প্রতি ০.৫ কেজি খৈল পুকুরে রটিফার (এক ধরণের প্রাণিকণা) উৎপাদনে সহায়ক।

৮. পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ

রেণু/ধানী মজুদের আগেই পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। রেণুর পুকুরে পানির রং থাকবে লালচে সবুজ বা বাদামি সবুজ। খালি চোখে দেখতে হবে পানির রং ঠিক আছে কিনা। ঠিক থাকলে পরিমিত খাবার আছে কিনা তা নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে হবে।

সেকিডিস্ক

এটি একটি লোহার চাকা যার ব্যাস ২০ সেমি এবং রং সাদা-কালো। এটি ৩টি রংয়ের ১টি সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। থালার গোড়া থেকে প্রথম অংশের রং লাল (২ সেমি), দ্বিতীয় অংশের রং সবুজ (১০ সেমি) এবং হাতে ধরার সর্বশেষ অংশের রং সাদা।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

পুকুরে রেণু/পোনা ছাড়ার অন্তত একদিন আগে পুকুরের পানির বিষাক্ততা দূর হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হয়। কেননা পানিতে বিষক্রিয়া থাকলে রেণু/পোনা মারা যাবে।

বিষাক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি: পুকুরে হাপা স্থাপন করে কিছু পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত দেখা, পোনা মারা গেলে বুঝতে হবে পানিতে বিষ ক্রিয়া হয়েছে, এ অবস্থায় পুকুরে পোনা মজুদ উচিত নয়, কিছু দিন অপেক্ষা করার পর আবারও বিষাক্ততা পরীক্ষা করে পোনা ছাড়া, পুকুরের বিষাক্ততার মাত্রা বেশি হলে পানি কমিয়ে এনে বা বদলিয়ে বিশুদ্ধ উৎসের পানি সংযোজন।

জলজ পোকা-মাকড় দমন

জলজ পোকা-মাকড় রেণু পোনার জন্য খুবই ক্ষতিকর। পুকুরের পানিতে এমনিতেই বিভিন্ন ধরনের জলজ পোকা-মাকড় জন্ম নেয়। যেমন- হাঁস পোকা (back swimmer), ড্রাগনফাই, ওয়াটার স্ট্রোক, আংগুলি পোকা (cutter piller) গোবর পোকা (water-bug) বড় আকৃতির জুপ্লাংকটন যথা- ক্লাডোসেরা, কপিপোড, (cyclops, daphnia, diaptomas) ইত্যাদি। পুকুরে যখন সার প্রয়োগ করা হয় তখন প্রাকৃতিক খাদ্যের বৃদ্ধি ঘটে এবং এর সাথে সাথে রেণু পোনার জন্য ক্ষতিকর পোকা-মাকড় এর বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এরা রেণু পোনা ধরে খেয়ে ফেলে অথবা পেট কেটে মেরে ফেলে। এ ছাড়াও পোকা-মাকড় রেণুর খাদ্য নষ্ট করে ফেলে। রেণু ছাড়ার পূর্বে নার্সারি পুকুর হতে এ সমস্ত জলজ পোকা-মাকড় ভালোভাবে দমন করতে হয়।

জলজ পোকা-মাকড় দমন পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক বা ডিজেল/কেরোসিন প্রয়োগ করে নার্সারি পুকুরের জলজ পোকা-মাকড় ভালোভাবে দমন করা যায়। নিচে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

- **সুমিথিয়ন:** ২-৩ মিলি/শতাংশ/ফুট পানির গভীরতা;
- **নোভান/নগস:** ২-৩ মিলি/শতাংশ/ফুট পানির গভীরতা।

কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় কীটনাশক একটি পাত্রের মধ্যে ১০ লি. পরিমাণ পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ডিপটারেক্স প্রয়োগের পর জলজ পোকা-মাকড় মারা যাওয়া শুরু করলে সমস্ত পোকা-মাকড় চটজাল দ্বারা তুলে ফেলতে হবে। দুপুরে রোদে ব্যবহার করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। কম তাপমাত্রা, মেঘ, কিংব বৃষ্টির সময় কীটনাশক ব্যবহার না করাই উচিত।

কীটনাশক ব্যবহারের সতর্কতা

- কীটনাশক ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারীকে মুখ, শরীর কাপড়ে ঢেকে নিয়ে চশমা পরে নিতে হবে;
- বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে;
- ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভাল করে গোসল করে নিতে হবে এবং সকল প্রকার কীটনাশক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

ডিজেল বা কেরোসিন

- প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১২৫ মিলি বা প্রতি ১০ শতাংশ জলাশয়ে ১ লি. প্রয়োগ করতে হবে (গড়ে পানির গভীরতা ৩ ফুট);
- পুকুরের পানি যখন ঢেউহীন অবস্থায় থাকবে তখন প্রয়োগ করতে হবে;
- পুকুরের পানিতে ঢেউ থাকলে চটজাল টেনে জালের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। এ প্রক্রিয়া ২/৩ বার করলে ভাল হয়;
- সমস্ত মরা পোকা-মাকড় তুলে ফেলতে হবে।

জাল টেনে: ঘন নাইলনের জাল (ঘন পলিস্টার নেট) বার বার টেনেও ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় সহনশীল মাত্রায় কমিয়ে আনা যায়।

উপরে বর্ণিত যে কোনো একটি পদ্ধতি রেণু ছাড়ায় ২৮ ঘন্টা পূর্বে অনুসরণ করতে হবে।

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

রেণু পোনা দুই পদ্ধতিতে প্রতিপালন করা যায়। এ পদ্ধতি নির্ভও করে রেণু ছাড়ার পরিমাণের ওপর। এর পরিমাণ আবার নির্ভর করে রেণুর জাত, পুকুরের আয়তন ও তার উৎপাদনশীলতার ওপর। ছোট ও মাঝারি পুকুর অধিকতর উৎপাদনশীল বলে বিবেচিত। চাষির অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।

১. রেণু ছাড়ার পরিমাণ

এক ধাপ পদ্ধতি

একই পুকুরে ২-৩ মাস রেণু ৫-১০ সেমি আকার পর্যন্ত লালন করা হয়। এপদ্ধতিতে রুইজাতীয় মাছের যে কোনো প্রজাতির ৪-৫ দিন বয়সের রেণু প্রতি শতাংশে ৮-১০ গ্রাম ছাড়া যায়। সঠিক ব্যবস্থাপনায় রেণুর বাঁচার হার শতকরা ৫০-৬০%।

দুই ধাপ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত নার্সারিতে ৪-৫ দিন বয়সের রেণু শতাংশ প্রতি ২৫-৩০ গ্রাম করে মজুদ করা যায়। প্রথমে অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুরে রেণু ছেড়ে এবং ১০-১২ দিন পর ধানী পোনা লালন পুকরে স্থানান্তর করে ৬-৮ সপ্তাহ লালন করে ৭-১২ সেমি আকার চারা পোনা করা যায়। এ পদ্ধতি অধিক লাভজনক। সঠিক ব্যবস্থাপনায় ধানী পোনার বাঁচার হার শতকরা ৮০ ভাগ।

প্রজাতি অনুযায়ী গ্রাম প্রতি রেণুর সংখ্যা

প্রজাতি	রেণুর সংখ্যা/গ্রাম	প্রজাতি	রেণুর সংখ্যা/গ্রাম
কাতলা	৪০০ টি	গ্রাস কার্প	৩৫০টি
রুই	৪৭৫টি	মিরর কার্প	৪০০টি
মৃগেল	৪০০টি	বিগ হেড	৩০০টি
সিলভার কার্প	৩২৫টি		

রেণু ছাড়ার পরিমাণ

প্রজাতি	এক ধাপ পদ্ধতি	রেণুর সংখ্যা/গ্রাম
সিলভার কার্প	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩৫ গ্রাম/শতাংশ
কাতলা	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩০ গ্রাম/শতাংশ
রুই	৮ গ্রাম/শতাংশ	২৫ গ্রাম/শতাংশ
মৃগেল	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩০ গ্রাম/শতাংশ
গ্রাস কার্প	৮ গ্রাম/শতাংশ	২৫ গ্রাম/শতাংশ
বিগ হেড	১০ গ্রাম/শতাংশ	৩৫ গ্রাম/শতাংশ

* একটি নার্সারি পুকুরে একই প্রজাতির রেণু চাষ করা ভাল।

ভাল রেণু শনাক্তকরণ

রেণু প্রাপ্তির উৎস দুইটি যথা: প্রাকৃতিক এবং হ্যাচারি। বাহ্যিক ও অনুকূল পরিবেশে মাছের প্রজনন ঘটে বিধায় প্রাকৃতিক উৎসের রেণুর মান ভালো থাকে। তবে অসুবিধা হলো প্রয়োজনীয় সময়ে পরিমাণমত ঈপ্সিত প্রজাতির রেণু না পাওয়া এবং এতে কাঙ্ক্ষিত ও

অনাকাঙ্ক্ষিত রেণুর মিশ্রণ থেকে যায়। অন্যদিকে হ্যাচারির উৎপাদিত রেণু নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উৎপাদিত হয়। ফলে পছন্দ ও চাহিদামত প্রজাতির রেণু সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ব্রুড মাছের গুণগত মান, পুষ্টি বজায় রাখা না হলে রেণুর গুণগত মান খারাপ হতে পারে।

ভাল রেণু চেনার উপায়

- চলাফেরায় সন্তরণশীল, দেহের রং কালচে-বাদামি/সবুজ;
- রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায় এবং স্রোতের বিপরীতে সাঁতরাতে সক্ষম।

পর্যবেক্ষণ বিষয়	ভাল রেণু	দুর্বল রেণু
দেহের রং	কালচে-বাদামি/সবুজ	ঘোলা, ফ্যাকাশে
আচরণ	চঞ্চল, দ্রুত সন্তরণশীল	অপেক্ষাকৃত ধীর, দুর্বল সন্তরণশীল
রেণুর পাত্রে হাত দেয়া	রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায়	রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায় না

রেণু পরিবহণ

হ্যাচারি থেকে অক্সিজেন ব্যাগে রেণু পরিবহণ করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে ব্যাগে যাতে কোনোভাবে ছিদ্র না হয় ব্যাগ ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে, বেশি ব্যাগ এক সাথে পরিবহন করা হলে বিকল্প অক্সিজেন সরবরাহ বা হাড়ির ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৬০ x ৪০ সেমি আকারের একটি পলিথিন ব্যাগে ৮-১০ ঘন্টার দুরত্বে ১২৫ গ্রামের বেশি রেণু পরিবহন করা উচিত নয়। তহে নির্ভরযোগ্য পরিমাণ হলো ৩-৫ গ্রাম/লিটার পানি।

খাপ খাওয়ানো ও পুকুরে রেণু ছাড়া

রেণুর ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা এনে রেণু ছাড়তে হবে। প্রথমে ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা এনে রেণু ছাড়তে হবে। এর জন্য রেণু পরিবহনকৃত ব্যাগটি ১০-১৫ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে। ব্যাগের মুখ আস্তে আস্তে খুলে হাত একবার ব্যাগের পানিতে আবার পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে তাপমাত্রা সমান আছে কিনা দেখতে হবে। থার্মোমিটারও ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান না হলে উভয় পানি বদলা-বদলী করতে হবে। এভাবে তাপমাত্রার ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসবে। রেণু ছাড়ার জায়গায় হাত দিয়ে তলদেশের পানি উপরের দিকে আন্দোলিত করে তাপমাত্রার সমতা আনতে হবে। তাপমাত্রার পার্থক্য যেন ২০ সে. বেশি না হয়। তাপমাত্রা সমতায় আসলে ব্যাগ কাত করে হালকা ঢেউ দিলে ব্যাগ থেকে রেণু ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। পাড়ের কাছাকাছি বাতাসের প্রতিকূলে রেণু ছাড়তে হবে।

রেণু ছাড়ার সময়

- সকালে অথবা বিকেল বেলা ছাড়াই উত্তম
- বৃষ্টি অথবা নিম্নচাপের দিনে রেণু ছাড়া ঠিক হবে না।

রেণু ছাড়ার পর তিন দিন পর্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পানি অধিক সবুজ ও শেওলাযুক্ত হলে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে অধিক অক্সিজেন রেণুর মড়ক ঘটবে। এমতাবস্থায় পুকুরের তলার কাধা তুলে সারা পুকুরে ছিটাতে হবে যেন পানি ঘোলা হয়। এতে সূর্যের আলো বাধাপ্রাপ্ত হবে। ফলে শেওলা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অধিক অক্সিজেন তৈরি করতে পারবে না।

মজুদপরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে যে প্লাংকটন জন্মে, রেণু বা বড় পোনা তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া রেণু মজুদের পর প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

রেণু মজুদের পর ৪টি কাজ গুরুত্বপূর্ণ

- প্রতিদিন ভোরে পুকুর পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- রেণু সাধারণত দল বেঁধে পুকুরের কিনার দিয়ে চলাফেরা করে, যা লক্ষ্য করলে খালি চোখেই দেখা যাবে।
- গামছা বা কাপড় টেনে প্রতি টানে যদি ৫-১০টি রেণু আসে তবে বুঝতে হবে বেঁচে থাকার হার ভাল।
- গামছা টানার পর রেণু থালায় নিয়ে দেখতে হবে। সুস্থ রেণু হবে সন্তরণশীল।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

রেণুর জন্য পুকুরে সরিষার খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভুমি খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আর্থিক বিবেচনায় চাষিরা এসব খাদ্য উপকরণ তাদের পুকুরে অধিকমাত্রায় ব্যবহার করে থাকে। এ সব খাদ্যে প্রোটিন মান কম কিন্তু প্রোটিন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খাবার তৈরিতে সহায়ক। খৈলের পরিবর্তে ফিসমিল ব্যবহার করা যায়। আবার খৈল (৩৫-৪০%) ভূসির (২০-২৫%) সাথে কসাই খাবার রক্ত (৩৫-৪০%) মিশ্রণে সম্পূরক খাবার অত্যন্ত কার্যকর। এ মিশ্রণ প্রয়োগে রেণু থেকে ধানী পর্যন্ত বেঁচে থাকার হার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ।

খাদ্যের পরিমাণ

খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের অবস্থা, রেণুর মোট ওজন, বয়স এবং তাপমাত্রার ওপর। সাধারণত রেণুর মোট ওজনের ২ গুণ হারে দৈনিক দু'বার খাবার দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ

১-৫ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ২ গুণ/দিন	১১-১৫ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৪ গুণ/দিন
৬-১০ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৩ গুণ/দিন	১৬-২০ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৫ গুণ/দিন

রেণু মজুদের প্রথম ৫ দিন শুধু খৈল প্রয়োগ সবচেয়ে ভাল। গবাদি পশুর রক্ত পাওয়া না গেলে খৈল ৫০ ভাগ ভুষি/কুঁড়া ৫০ ভাগ হারে ধানী কাটাই না করা পর্যন্ত দিতে হবে। সিরিষার খৈল অন্তত ১০ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে তার সাথে মিহি কুঁড়া/ভুসি ভালোভাবে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগঃ রেণু মজুদের পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন নিম্নহারে অজৈব সার দিতে হবে

সার	পরিমাণ (গ্রাম/শতাংশ/দৈনিক)
ইউরিয়া	৪-৫
টিএসপি	৩

প্রয়োগ পদ্ধতি

অজৈব সার পুকুর প্রস্তুতকালীন পদ্ধতির অনুরূপ

রেণু মজুদের পর আরও সে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে:

- খুব সকালে রেণু ভেসে উঠতে পারে। তখন পানির ঝাপটা, সম্ভব হলে নতুন পানি দিতে হবে;
- সকালে ও বিকালে হররা টেনে তলার বাজে গ্যাস বের করে দিতে হবে;
- রেণু ছাড়ার ৫-৭ দিনের মধ্যে চট জাল টানা যাবে না ও মেঘলা দিনে সার ও খাবার দেয়া যাবে না;
- অধিক তাপমাত্রায় পুকুরে পানি গরম হয়ে গেলে ছায়া ব্যবস্থা করতে হবে এবং সম্ভব হলে ঠান্ডা পানি সরবরাহ করতে হবে।

ধানী পোনা কাটাই

রেণুপোনা আরো বড় হয়ে ধানের আকার বা ১.৫-২ সেমি এর বড় হলে, তাদেরকে ধানীপোনা বলে। নিয়মিত সার ও খাবার দিলে ১০-১২ দিনের মধ্যেই ধানীপোনা কাটাই বা স্থানান্তর করা যায়।

- **কাটাই পদ্ধতি ও সময়-** সকাল বেলাতেই ধানী কাটাই করা ভালো। কাটাই করার আগের দিন পুকুরে জাল টেনে পোনাগুলোকে অল্প পানির ঝাপটা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। পরদিন সকালে জাল টেনে, সতর্কতার সাথে পোনাগুলোকে একত্র করে বার বার পানির ঝাপটা দিতে হবে। তারপর অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল বা পলিথিন ব্যাগে কম ঘনত্বে ধানী পোনা লালন পুকুরে স্থানান্তর করা উচিত।
- **ধানী থেকে চারা পোনা উৎপাদন-** ধানী পোনা আরো বড় হয়ে হাতের আঙ্গুলের মতো বা আরো বড় আকার ধারণ করলে (৭ সেমি এর উপর, ওজন ৫-২৫ গ্রাম) তাদেরকে চারাপোনা বলে।
- **পুকুর প্রস্তুতি-** নার্সারি পুকুরের মত লালন পুকুরও এই নিয়মে তৈরি করা হয়। তবে কোন কীটনাশক ব্যবহারের দরকার নেই।

মজুদ ঘনত্ব এবং হার

- প্রতি শতাংশ ধানী মজুদ করা যাবে ৮০০-১০০০টি (একক বা মিশ্র);
- একই পুকুরে এক জাতের অথবা বিভিন্ন জাতের ধানী একসাথে মজুদ করা যাবে;
- আলাদা আলাদা পুকুরে আলাদা আলাদা প্রজাতির ধানী মজুদ করা ভাল।

নিচের নিয়মে পুকুরে ধানী পোনা মজুদ করা যায়

প্রজাতি	এক ধাপ (সংখ্যা)	দুই ধাপ (সংখ্যা)
কাতলা	১৫০-২০০	-
সিলভার কার্প	২০০-২৫০	১৭৫-২০০
বিগ হেড	-	১৫০-২০০
রুই	১৫০-২০০	১০০-১৫০
মৃগেল	১০০-১২৫	১৫৮০-২০০
কার্পিও	১০০-১২৫	১৫০-১৫০
গ্রাস কার্প	১০০-১০০	৭৫-১০০
সর্বমোট	**৮০০-১০০০টি**	**৮০০-১০০০ টি**

পোনা পরিবহন ও ছাড়া

- পলিথিন ব্যাগ, পাতিল বা ব্যারেলে ধানী পরিবহন করা যায়। পরিবহন ঘনত্ব নির্ভর করে পোনার প্রজাতি, শারীরিক অবস্থা, দুরত্ব এবং তাপমাত্রার ওপর।
- রেণু ছাড়ার মতোই পুকুরের পানির তাপমাত্রার সাথে সহনশীল করে আস্তে আস্তে ধানী পোনা ছাড়তে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ

- প্রতিদিন পোনাকে তাদের ওজনের ৫-১০% হারে খাবার দেয়া উচিত;
- পোনার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য চালের মিহি কুঁড়া/গমের ভুসি ও খৈল ব্যবহার করা যায়;
- ভালো উৎপাদনের জন্য প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য দরকার, খাদ্যে প্রোটিন পরিমাণ ২৫-৩০% হলে ভাল হয়;
- রক্ত/ফিসমিল ব্যয় সাধ্য। এগুলো না পাওয়া গেলে খৈল ৫০ ভাগ ও ভুসি ৫০ ভাগ হারে ব্যবহার করা যাবে;
- পুকুরে গ্রাস কার্প/স্বর পুঁটির পোনা থাকলে ক্ষুদিপোনা ১৫০-২০০ গ্রাম/শতাংশ/দিন হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে;

- প্রতিদিন মোট খাবারের অর্ধেক সকালে এবং অবশিষ্ট বিকেলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে;
- ট্রেতে খাবার দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় ।

সার প্রয়োগ: নার্সারি পুকুরের মতো লালন পুকুরে নিয়মিত সার দিতে হবে । প্রয়োগ মাত্রা এবং পদ্ধতি নার্সারি পুকুরে সার প্রয়োগের মতোই, তবে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের অবস্থা অনুযায়ী সার কম বেশি হবে । পানির রং বেশি সবুজ হলে মেঘলা দিনে পুকুরে সার ও খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে ।

হররা টানা: পোনা মজুদের পর মাঝে মাঝে সকালে/বিকেলে হররা টেনে দিলে পুকুরের তলায় বাজে গ্যাস জমতে পারবে না । নমুনায়ন: ২-৩ সপ্তাহ পর পর জাল টেনে পোনার স্বাস্থ্য, ওজন এবং আনুমানিক বেঁচে থাকার হার পরীক্ষা করাসহ পোনার খাদ্য মাত্রার প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ণয় করা যায় ।

৮.২ শিং মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা

যে কোন মাছচাষে উত্তম ফলাফল প্রাপ্তির পূর্বশর্ত সঠিক আকারের ও ভাল মানের পোনা নিশ্চিত করা । নিজস্ব নার্সারি ছাড়া সঠিক সময়ে সঠিক আকারের পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া যায় না । শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ।

পুকুর প্রস্তুতি: পানি নিস্কাশন করে পুকুর শুকিয়ে তলদেশে অতিরিক্ত কাদা অপসারণ করে ফেলতে হবে; পুকুরের ঢালে গর্ত থাকলে তা ভরাট করে ঘাস থাকলে তা পরিস্কার করে ফেলতে হবে ।

ব্লিচিং প্রয়োগ: পুকুরের তলদেশ শুকানো না হলে যদি ভিজা কাদা কাদা থাকে তবে প্রতি শতকে ১০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার পানিতে গুলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে । ব্লিচিং পাউডার পুকুরের তলদেশের সকল জীবাণু ধবংশ করবে । শুকনা পুকুরে ব্লিচিং প্রয়োগের প্রয়োজন নাই ।

চুন প্রয়োগ: পুকুরে ব্লিচিং প্রয়োগের পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে পোড়া চুন পানিতে ভালভাবে গুলিয়ে ঢালসহ পুকুরের তলায় ছিটিয়ে দিতে হবে ।

রেণু সংগ্রহ: সুনাম আছে, নিজস্ব উৎসের মা-মাছ হতে রেণু উৎপাদন করে এবং পরিচিত পুকুর প্রস্তুতির পুর্বে এরকম হ্যাচারির সাথে যোগাযোগ করে রেণু গ্রহণের দিন নির্ধারণ করতে হবে । মনে রাখতে হবে ভাল মানের রেণু হলে তা থেকে ভাল মানের পোনা তৈরি হবে । সাধারণত রেণু অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহন করা হয় ।

পুকুরে পানি সরবরাহ: রেণু প্রাপ্তির ১-২ দিন আগে পুকুরে ১.৫-২.৫ ফুট গভীরতা পর্যন্ত পানি সরবরাহ করতে হবে । পুকুরের অগভীর অংশে কিছুটা ঘাস থাকলে ভাল হয় । কারণ শিং মাছের পোনা প্রাকৃতিগতভাবে অগভীর পানির ঘাসযুক্ত স্থানে চরে বেড়ায় । দিনের সুর্যের প্রখরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলাশয়ের গভীর অংশে চলে যায় । পানি প্রবেশের পর পূর্ব থেকে তৈরি ইষ্ট মোলাসেস এর পানির মিশ্রণ সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে । এতে পুকুরে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় জুপ্লাংকটন তৈরি হবে ।

৩০ শতাংশ জলায়তনের পুকুরের জন্য একটি পাত্রে ২০ লি. পানির সাথে ১০ কেজি অটোকুঁড়া, ৬ কেজি চিটাগুড় ও ৫০ গ্রাম ইস্ট ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে পুকরে প্রয়োগ করতে হবে।

নার্সারি পুকুরের চারিদিকে বেড়া স্থাপন: নার্সারি পুকুরে অধিক ঘনত্বে ছোট আকারের পোনা মাছ থাকে এবং এ পোনা মাছ সাপ এবং ব্যাঙের উত্তম খাবার তাই পুকুরে যাতে কোন প্রকার ক্ষতিকর প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য নার্সারি পুকুরের চারদিকে বেড়া দিতে হবে । বেড়া দেয়ার জন্য বাঁশের বানা অথবা ঘন ফাঁসের নাইলনের জাল ব্যবহার করা যেতে পারে ।

রেণুর জন্য ক্ষতিকর পোঁকা মাকড় দমন: পুকুরে পানি প্রবেশ করানোর পর বা পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির পাশাপাশি শিং মাছের রেণুর জন্য ক্ষতিকর হাঁস পোকা জন্মাতে পারে । হাঁসপোকা দূও করার জন্য ৩০ শতাংশ পুকুরে ১ লিটার কেরোসিন বা ডিজেল মৃদু বাতাস প্রবাহের অনুকুলে ধীরে ধীরে ছিটাতে হবে । বাতাসের প্রবাহ অধিক হলে কেরোসিনের কার্যকারীতা কম হবে । কিন্তু রেণু ছাড়ার ঠিক আগের দিন পুকুরে পানি প্রবেশ করালে কেরোসিন না দিলেও চলবে ।

রেণু মজুদঃ হ্যাচারি থেকে রেণু নির্ধারিত দিনে সংগ্রহ করে পুকুর পাড়ে আনতে হবে। প্রতি ৩০ শতাংশের পুকুরে ১ কেজি পরিমাণ রেণু মজুদ করা যেতে পারে। রেণু ভোরে অথবা বিকালে পুকুরে ছাড়লে ভাল হয়। রেণু আনার সাথে সাথে রেণুসহ অক্সিজেন ব্যাগ পুকুরের পানিতে রাখতে হবে। পুকুরের পানি কোন কারণে গরম থাকলে পানি আলোড়িত করে পুকুরের তলদেশের ঠান্ডা পানি উপরে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। অক্সিজেন ব্যাগ খুলে পুকুরের পানির সাথে রেণুর খাপ খাইয়ে ধীরে ধীরে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

রেণু মজুদের সময় অন্যান্য করণীয়ঃ রেণু ছাড়ার পুর্ব মূহূর্তে পুকুরের পানি জীবাণু মুক্ত রাখার জন্য বাজারে প্রাপ্ত যে কোন একটি ভাল মানের জীবাণুনাশক পরিমাণমত পুকুরে ছিটিয়ে পানির সাথে মিশাতে হবে। এজন্য পুকুরের তলদেশ মই দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। এ সময় পুকুরের তলদেশের জমে থাকা গ্যাস দূর করার জন্য বাজারে প্রাপ্ত যেকোন একটি ইয়োকা নির্জাস সমৃদ্ধ ঔষধ ২-৩ মিলি (৩-৪ ফুট গভীরতায়) প্রতি শতাংশে প্রয়োগ করতে হবে। এর পাশাপাশি রেণু ছাড়ার সময় পানিতে অক্সিজেনের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম হারে সোডিয়াম পার কার্বনেট (১২-১৩%) দিলে ভাল হয়।

খাদ্য প্রয়োগঃ রেণু ছাড়ার ৪-৫ ঘন্টা পর প্রতি কেজি রেণুর জন্য ১০-১২টি সিদ্ধ ডিমের কুসুম পানিতে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং এসময় ভিটামিন প্রিমিক্স মিশিয়ে দিলে ভাল হয়। ডিমের কুসুম পানিতে ভালভাবে গুলানোর সময় ভিটামিন তাতে মিশাতে হবে। মিশ্রিত দ্রবণ সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। রাত্রে একই ভাবে খাদ্য প্রয়োগের সময় আর এক বার সোডিয়াম পার কার্বনেট আগের মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে ২ দিন পরে যে কোন ভাল ব্রান্ডের নার্সারি খাদ্য (১ কেজি পাউডার) পানিতে ভিজিয়ে একবার ভোরে এবং আর একবার সন্ধায় প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে ১০-১৫ দিন প্রতিপালনের পর পোনা যখন পানির উপরের তলে যাওয়া-আসা শুরু করবে তখন পাউডার খাদ্য পুকুরের পানির ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। প্রাকৃতিক খাদ্য কম থাকলে পূর্বে আলোচিত পদ্ধতিতে অটোকুড়া, মোলাসেস এবং ইস্ট প্রক্রিয়াজাত করে পুকুরে দিতে হবে। চাষ চলাকালে পুকুরের তলদেশের গ্যাস দূর করার জন্য প্রতি সপ্তাহে একবার করে স্বল্প ডোজে জিওলাইট (১০০ গ্রাম/শতাংশে) এবং তার সাথে গ্যাস শোষণকারী রাসায়নিক প্রকুরে প্রয়োগ করতে হবে। পোনা নিরাপদ রাখার জন্য ১০-১২ দিন পর আবার এক ডোজ জীবানুনাশক ব্যবহার করতে হবে।

নার্সারি পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনঃ নার্সারি পুকুরের পানি রেণু ছাড়ার ২-৩ দিনের ভিতর সবুজ করতে হবে যাতে পুকুরের তলদেশে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে না পারে। ইস্ট মোলাসেস দিলে পুকুরে জুপ্লাংটনের আধিক্য বাড়ে কিন্তু পানির স্বচ্ছতা কমানোর জন্য সরিষার খৈল ভেজানো পানি পুকুরে দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে ২-৩ দিন আগে একটি পাত্রে ৪-৫ কেজি সরিষার খৈল ভেজাতে হবে। খৈল ভেজানোর ২ ঘন্টা পর সমস্ত পানি উপর থেকে ফেলে দিতে হবে কারণ উক্ত পানিতে তৈলের একটি স্তর পড়ে। প্রথম বারের পানি ফেলে দিয়ে আবার পানি দিয়ে রখতে হবে। খৈল ভেজানো পানি ২৪ ঘন্টা পরপর ২-৩ দিন পুকুরে দেয়া যাবে। এর পরে ভেজানো খৈল অন্য পুকুরে ব্যবহার করতে হবে। খৈল ভেজানো পানি পুকুরে প্লাংকটোন জন্মাতে সাহায্য করবে।

আশ্রয় স্থল ও পুকুরের চারিদিকে বেড়া স্থাপনঃ রেণু পোনার আশ্রয়স্থল হিসেবে পুকুরের কয়েকটি স্থানে কচুরী পানা সুতা ও লাঠির সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে। এসব আশ্রয়স্থলে পোনা দিনের বেলা আশ্রয় নেয় এবং পোনার বর্ণ স্বাভাবিক রাখা যায়। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে সব ধরণের মাছের নার্সারির ক্ষেত্রে নাইলনের জাল দিয়ে পুকুরের চারদিকে অবশ্যই বেড়া দিতে হবে। কারণ যেখানে পোনা চাষ করা হয় সেখানে সাধারণত মাছ শিকারী প্রাণী যেমন সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রবেশ করে প্রচুর পোনা খেয়ে ফেলে। পোনার জৈব নিরাপত্তা (Biosecurity) নিশ্চিত করতেও পুকুরের চারিদিকে বেষ্টনি দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

রেণুর পরিচর্যাঃ রেণু প্রতিপালন চলাকালে পুকুরের পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। পুকুরের তলদেশে গ্যাস জমছে কিনা সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। যেহেতু অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য পুকুরে দেয়া হয় সেজন্য উচ্ছিষ্ট খাদ্য পুকুরের তলায় জমে গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য গ্যাসশোষণ কারী রাসায়নিক প্রয়োগের পাশাপিাশ পানির অবস্থা বুঝে হররা টানতে হবে। হররা সূর্য উঠার পর বেলা ১১-১২ টার সময় পুকুরের এক পাশ থেকে অপরপাশে আবার অপর পাশ থেকে এপাশ এভাবে হররা টেনে পুকুরের তলদেশ ওলোটপালোট করে দিতে হবে। এ সময় যে কোন একটি ভাল মানের প্রোবায়টিক্সও ব্যবহার করা যেতে পারে। পুকুরে রেণু বাঁচার

হার, তাদের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করলে সার্বিক সমস্যা বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। পুকুরে জুপ্লাংটনের প্রাচুর্যতা ভাল থাকলে পুকুরে খাবার কম দিতে হবে। নার্সারি পুকুরে হাঁস পোকা বেশি হলে পূর্বের ন্যায় ৩০ শতাংশে ৫০০ এমএল কেরোসিন পুনরায় পুকুরে দিতে হবে। এভাবে রেণু ৩০-৩৫ দিন পালন করলে পোনা চাষের পুকুরে ছাড়ার আকার অর্থাৎ কেজিতে ২০০০-২৫০০ বা ১.৫-২ ইঞ্চি আকার হয়ে যাবে।

পোনা আহরণ এবং বিক্রয়: সাধারণত শিং মাছের পোনা আহরণ করতে হয় খুব ভোরে কারণ দিনের বেলায় জাল টানলে পোনা আনেক সময় কম ধরা যায়। পোনা ধরার সময় ঘন ফাঁস বিশিষ্ট প্লাষ্টিকের মসৃণ জাল দিয়ে পোনা ধরতে হবে যাতে পোনা কোনভাবেই আঘাত প্রাপ্ত না হয়। পোনা জাল থেকে হাউজে নেওয়ার সময় পাতিলে পানিসহ পরিবহন করতে হবে। কোন ভাবেই পোনা পানি ছাড়া পরিবহন করা যাবে না। কারণ শিং মাছের গায়ে আঁইশ নাই এবং গায়ের ত্বক পাতলা এবং কানকোয়ার দুপাশে দুটি সুচালো বিষাক্ত কাটা আছে। পানি ছাড়া পোনা পরিবহন করে হাউজে আনলে কাটায় পোনা আহত বা চামড়া ছিড়ে যেতে পারে বা চামড়া ছিদ্র হয়ে যেতে পারে। ক্ষত স্থানে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে, এ সংক্রমণ সমস্ত পোনা মাছে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এখানে আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেন একই কারণে পোনা পরিমাপের সময় বা পোনা অক্সিজেন ব্যাগে প্যাকেটিং এর সময় প্লাষ্টিকের ছিদ্রযুক্ত ঝুঁড়ি ব্যবহার করা না হয়। এ ক্ষত্রে মসৃণ স্টিলের ছিদ্রযুক্ত গামলা বা বাটি ব্যবহার করতে হবে। শিং মাছের পোনার ত্বকে ক্ষত হলে পরবর্তীতে পোনার ব্যাপক মড়ক দেখাদিতে পারে। এজন্য শিং মাছের পোনা সর্তকতার সাথে নাড়া চাড়া (Handling) করতে হয়। পোনা বিক্রয়ের আগের দিন পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ না করাই ভালো। সাধারণত ভালভাবে পরিচর্যা করলে ১ কেজি রেণু থেকে ১ লক্ষ হতে ২ লক্ষ পোনা উৎপাদিত হয়।

৮.৩ পাবদা মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা

নার্সারি পুকুর প্রস্তুতি- (শিং মাছের নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির অনুরূপ)।

মজুদকালীন করণীয়- নার্সারি পুকুরের পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট করে নিয়ে সকালে সম্পূর্ণ পুকুরের তলায় মই দিতে হবে। রেণু ছাড়ার সময় পানিতে অক্সিজেনের প্রাচুর্য বৃদ্ধির জন্য প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম হারে সোডিয়াম পার কার্বনেট (১২-১৩%) দিলেভাল হয়।

রেনুর মজুদ ঘনত্ব- প্রতি শতাংশে ৪০-৬০ গ্রাম রেনু মজুদ করা যায়।

রেনু পোনা খাপ খাওয়ানো- রেনু ছাড়ার সময় পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও প্রতিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। প্রথমে রেনুপোনা বহনকারী অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগের মুখ না খুলে পুকুরের পানিতে ১০-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এরপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুর থেকে হাতের তালুতে পানি নিয়ে ব্যাগের ভিতর ঝরণার মত করে পানি ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ব্যাগের ভিতরের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান বা কাছাকাছি হয়ে গেলে ব্যাগটি হাল্কা কাত করে আস্তে ধীরে রেনু পোনা পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে।

রেনু পোনা শোধন- রেনু অবমুক্ত করার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম ৪০% এন-এলকাইল ডাই মিথাইল বেনজাইল এমোনিয়াম ক্লোরাইড, ৬০% স্ট্যাবিলাইজড ইউরিয়া জাতীয় জীবাণুনাশক প্রয়োগ করে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রেনুপোনাগুলো রক্ষা করা যায়।

নার্সারি পুকুরে খাদ্য ব্যবস্থাপনা-

নার্সারি পুকুরে খাদ্য সরবরাহের তালিকা

দিন/রেণুর বয়স (দিন)	রেণুর ওজন (গ্রাম)	খাদ্য	প্রয়োগমাত্রা

১-৩	১০০	আটা/ময়দা- ১০০ গ্রাম হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম- ১টি	৩ বারে প্রয়োগ, সকাল-৮.০০ টা, সন্ধ্যা-৬.০০টা ও রাত্রি ১০.০০ ঘটিকায়
৪-৭	১০০	৩৫-৪০% প্রোটিন সমৃদ্ধ নার্সারী ফিড (পাউডার) ১০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
৮-১০	১০০	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ২০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
১৬-২১	১০০	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ৪০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
২২-৩০	১০০	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ৫০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা

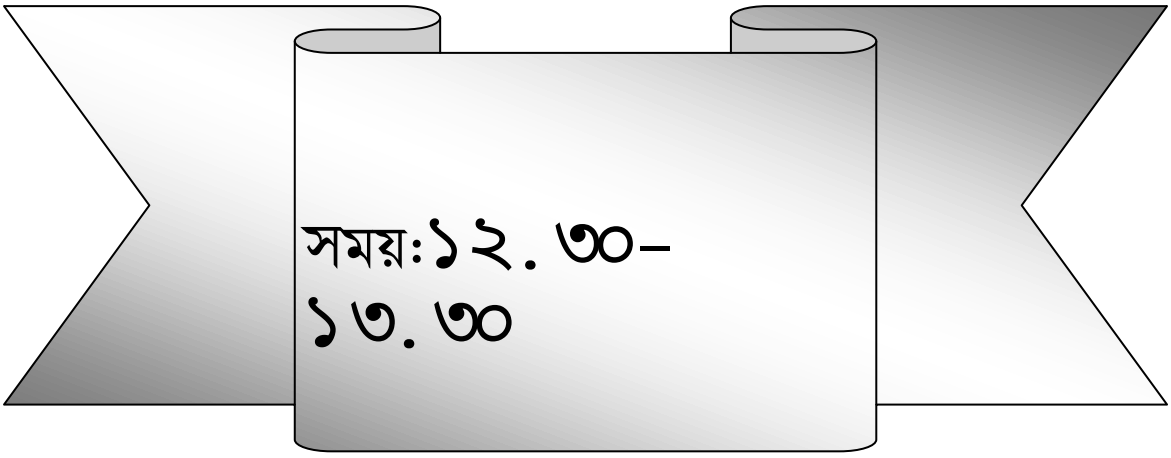

- মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যায় বরফের ব্যবহার
- মাছের রোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা যাচাই, এবং
- সমাপনী

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	সময়: ১২.৩০-১৩.৩০	মেয়াদকাল: ৬০মিনিট

শিরোনাম: মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যায় বরফের ব্যবহার, মাছের রোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা যাচাই, এবং সমাপনী
অভীষ্ট দল: মাছচাষ **প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষি**

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীদের মৎস্য আহরণোত্তর পরিচয় বরফের ব্যবহার সম্পর্কে জানানো হবে যাতে তারা মৎস্য আহরণের পরবর্তী সময়ে মাছের পচন রোধে বরফ ও বরফের ব্যবহার, মাছ হিমায়িতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বরফায়নের সুবিধা মাঠ পর্যায়ে কাজে লাগতে পারে। এ ছাড়া মাছের রোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও জানানো হবে যাতে তারা পরবর্তী সময়েমাছ ও চিংড়ির সাধারণ রোগ, রোগের কারণ, রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং মাছ ও চিংড়ি চাষে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সম্যক ধারণা দেয়া যাতে তারা মাছের রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় চাষিদের মাঠ পর্যায়ে সহায়তা করতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

- মৎস্য আহরণ পরবর্তী সময়ে মাছের পচন রোধে করণীয় পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবে।
- হিমায়িত কারণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবে।
- বরফ ও বরফের ব্যবহার এবং বরফায়নের উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- মাছের রোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্প্রসারণ কাজে মাছ চাষিদের অধিকতর সহায়তা করতে পারবেন।
- মাছ ও চিংড়ি চাষের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও উদ্ভবের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঝুঁকির কারণ নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে চাষিদের সহায়তা করতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৪ মিনিট
	• স্বাগতম • পর্ববর্তী অধিবেশনের আলোকপাত • বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট

	• মাছ কেন পচে? • বরফ ও বরফের ব্যবহার • হিমায়িতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি • বরফায়নের উপকারিতা • মাছের রোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা • প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা যাচাই	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ফ্লিপচার্ট/ মাল্টিমিডিয়া	
সার-সংক্ষেপ			৬ মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, হ্যান্ডআউট, মাল্টিমিডিয়া, ভিপকার্ড, ইত্যাদি।			

মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যায় বরফের ব্যবহার

১. ভূমিকা

সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়ে দেশ এখন মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখনকার চ্যালেঞ্জ এই অর্জনকে স্থায়িত্বশীল করা। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম চালু রাখার পাশাপাশি অপচয় হ্রাস করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দেশে যত মাছ উৎপাদিত হয় তার সবটাই পুষ্টিমান সহকারে ভোক্তার কাছে পৌঁছায় না, অপচয় হয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ, মাছ খুবই পচনশীল দ্রব্য, মাছ ধরার পর দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ না করা হলে পচে যায়, ফলে এর পুষ্টিমানও দ্রুত কমে যায়। দেশের জন্য এর পুরোটাই অপচয়। অথচবরফ দেওয়ার মত সহজ কিছু ব্যবস্থা নিলে এই অপচয় বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

২. মাছ কেন পচে?

মাছ পচার তিন কারণঃ

১) ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে
২) এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে
৩) তেলের অক্সিজেন যৌগের ফলে (oxidation)

ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণই মাছ পচে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া যদি ভাল টাটকা মাছের সংস্পর্শে আসে তাহলে ভয়ানক রোগের সৃষ্টি হতে পারে এবং ঐ মাছ খেয়ে মানুষ মারাও যেতে পারে। যদি পরিষ্কার ও যথোপযুক্ত ভাবে বরফে রাখা হয়, এর সংক্রমণ কমিয়ে রাখা যায় এবং ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিরহার নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তাহলে মাছকে অনেক বেশি সময় ধরে ভাল রাখা সম্ভব।

উপযুক্ত পরিবেশ না হলেব্যাকটেরিয়া এবং এনজাইম (enzyme: এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যামাংসপেশী, নাড়িভুঁড়ি, পরিপাকনালিতে পাওয়া যায় অথবা ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক তৈরি হয়) মাছ পচাতে পারেনা। এ দুটোরই প্রয়োজন উষ্ম তাপমাত্রা, খুব ঠান্ডাও নয় এবং খুব গরমও নয়। ব্যাকটেরিয়া টিকে থাকার জন্য পানি বা আদ্রতার প্রয়োজন। আর দরকার একটা কিছু খাদ্য যার উপর ভিত্তি করে টিকে থাকতে পারে – এক্ষেত্রে তা মাছের মাংস।

মাছেরপচন প্রক্রিয়া দ্রুত হয় কী করে? এটি হয়ঃ

- আহরণের সময়ে মাছ ছোটাছুটি করলে বা উত্তেজিত হলে,
- খারাপ পরিচর্যা: ফলাফল আহত হওয়া বা পেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় দুর্বল ব্যবস্থাপনা (Improper sanitation)
- সংক্রমণ
- বরফ দেওয়ায় বিলম্ব
- সরাসরি সূর্য কিরণের নিচে রাখা

বরফ প্রয়োগে বিলম্ব – মাছের পচন কাজ দ্রুত করার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী।

কীভাবে মাছেরপচন বিলম্বিত বা বন্ধ করা যায়?মাছের পচন বিলম্বিত বা বন্ধ করা যেতে পারে ঃ

অপ্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ হলে

- মাছকে শারীরিক ভাবে আহত না করে বা মাংসপেশীর ক্ষতি না করে,
- স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে মাছের পরিচর্যা করে এবং রোগজীবাণু ও সংক্রমণ পরিহার করে,
- দ্রুত তাপমাত্র কমিয়ে : পরিবহন এবং মজুদকালে ঠান্ডা পরিবেশ বজায় রেখে।

প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ হলে

- উচ্চতাপমাত্রা প্রয়োগ করে যেমন ক্যানিং (Canning), তাপ প্রয়োগ, ইত্যাদি দ্বারা এনজাইম ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে (ফিশ বল, ফিশ সসেজ, ফিশ স্টিক, ফিশ বার্গার, ইত্যাদি প্রস্তুতকালে)
- শরীর থেকে পানি কমিয়ে (শুকনো মাছ/ শুটকি মাছ, নোনা শুটকি, সংরক্ষণ কালে ধোঁয়া দিয়ে শুকিয়ে, ইত্যাদি)

আহরণের পরপরই মাছের পরিবেশের তাপমাত্রা কমিয়ে আনা মাছ পচন বিলম্ব বা বন্ধ করার অন্যতম উপায়। মাছের তাপমাত্রা কমাতে বরফকুচি দিয়ে বরফায়িত করা সবচেয়ে সহজ এবং সুলভ উপায়।

বরফ ও বরফের ব্যবহার

মাছ সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে বেশি যে প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হয় তা হলো মাছের গায়ের তাপমাত্রা কমিয়ে এনে বেশি সময়ের জন্য মাছ ভাল রাখা। তাপমাত্রা কমিয়ে আনার বিষয়টি প্রধানত হিমায়িতকরণ বা Chilling নামে পরিচিত।

মাছের হিমায়িতকরণ (Chilling)

এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তাপ কমিয়ে মাছের তাপমাত্রা হিমাংক তথা ফ্রিজিং পয়েন্টের কাছাকাছি নিয়ে আসা হয় তবে তার থেকে নিচে নয়। বিভিন্ন মাছের হিমাংক -০.৬ থেকে -২.২°C সে. তাপমাত্রার হয়ে থাকে তবে এটিকে সাধারণত -১°C ধরে নেওয়া হয়। এভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ এবং মৎস্যজাত দ্রব্যকে হিমায়িত দ্রব্য (Chilled Products) বলা হয়।

অতিহিমায়িতকরণ (Super Chilling)

মৎস্য শিল্পে অতিহিমায়িতকরণ বলতে বুঝায় মাছের তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে এনে মাছ মজুদ করা। এ তাপমাত্রায় মাছের অর্ধেক মাংস হিমাংকে পৌঁছে যায় অর্ধেক জমে যায়। অতিহিমায়িত মাছ -২.২°C এর চেয়ে এমনকি এক ডিগ্রি কম তাপমাত্রায় মজুদ করা হয়। অতিহিমায়িতকরণে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা -২.২°C যা - ২.০ থেকে -৫.০°C পর্যন্ত কম বেশি হতে পারে। এই তাপমাত্রায় মাছের পানির অর্ধেক জমে যায়। কম বেশি হওয়ার কারণ হলো মাছের গায়ের পানিতে অন্যান্য দ্রব্যের উপস্থিতির পরিমাণের ভিন্নতা। মাননিয়ন্ত্রণের মাপকাঠিতে বলা যায় যে, বরফে মাছ যত দিন ভাল রাখা যায় তার চেয়ে অতি হিমায়িত মাছ ২-৩ সপ্তাহ অধিক সংরক্ষণযোগ্য।

হিমায়িতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

১. বরফ দিয়ে মাছ ঠান্ডা করে,
২. মাছের গায়ের উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত করে,
৩. হিমায়িত পানিতে মাছ চুবিয়ে (যেমন সমুদ্রের হিমায়িত পানি),
৪. শুকনা বরফ (Solid carbondioxide), তরল নাইট্রোজেন, ঠান্ডা এ্যামোনিয়া এবং অন্যান্য হিমকারক (refrigerant), ইত্যাদি দ্বারা মাছ হিমায়িত করে।

মাছের বরফায়ন

বরফে ঢেকে মাছের তাপমাত্রা কমিয়ে আনা এক ধরনের হিমায়িতকরণ প্রক্রিয়া। বরফের তাপ শোষনের উচ্চ ক্ষমতা এটিকে একটি আদর্শ হিমায়িতকরণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মাছের বরফায়ণ একটি সহজ প্রক্রিয়া, এতে খুব উঁচু মাপের দক্ষতার প্রয়োজন পরে না। দেশে বরফ সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং ঠিকঠাক মত বরফ দেওয়া হলে মাছ ২০ থেকে ৩০ দিন যাবৎ গ্রহণযোগ্য থাকে। অবশ্য সঠিক জ্ঞানের অভাবে সনাতন মৎস্য পরিচর্যা ও সংরক্ষণে সঠিকভাবে বরফ প্রয়োগ করা হয় না। অথচ বরফ সঠিক ভাবে ব্যবহার করা হলে আহরণোত্তর অপচয় বন্ধ হওয়ার পাশপাশি সংরক্ষিত মাছের গুণগত মানেরও উন্নতি ঘটে।

বরফায়নের উপকারিতা

প্রথমত: বরফ তাপমাত্রা কমিয়ে মাছের পচন রোধ করে। তাছাড়া বরফ প্রয়োগের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধাদিও পাওয়া যায়:

- বরফগলা পানি মাছের গায়ের রোগজীবাণু ও দুষণকারী পদার্থসমূহ ধুয়ে দূর করে ফেলে,
- বরফগলপরবর্তী সময়ে পানি মাছের শরীর ভেজা রেখে শুকিয়ে যেতে দেয়না ফলে মাছের চকচকে চেহারা অক্ষুণ্নথাকে,
- এই পানি মাছকে ঠান্ডা রাখতেও সাহায্য করে,
- সুপেয় পানি ব্যবহার করে বরফ তৈরি করলে তা বিষাক্ত (toxic) নয়, নিরাপদ,
- বরফ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজেই স্থানান্তর করা যায়। বস্তুতপক্ষে, এটিকে বহনযোগ্য হিমায়ন পদ্ধতিও বলা যায়।
- যেহেতু বরফ $O^{\circ}C$ এ গলে যায় সেহেতু বরফ মাছকে ঠান্ডায় জমিয়ে ফেলতে পারে না বরং আদর্শ ঠান্ডা মাত্রায় রাখার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে,
- সংরক্ষণের অন্য পদ্ধতিসমূহ থেকে বরফায়ন অপেক্ষাকৃত সুলভ ও সস্তা,
- বরফ বাক্স (Ice box) না পাওয়া গেলে যেকোন পাত্রে বরফ দিয়ে মাছ রাখা যেতে পারে,
- যেকোন জায়গাতেই মাছে বরফ দেওয়া যায়। মাছে বরফ সবাই দিতে পারে - জেলে, পরিবহনকারী, বড়-ছোট ব্যবসায়ী, ভোক্তা, সবাই।

বরফ তৈরিতে কেমন পানি ব্যবহার করা উচিৎ?

পানির গুণাগুণের ওপর বরফের মান নির্ভর করে। ভাল মানের বরফ না হলে সংরক্ষণ যথাযথ হবে না, মাছ বরং দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে বরফ তৈরির জন্য যে পানি ব্যবহার করা হবে তার মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

- বরফ তৈরিতে পরিষ্কার এবং দূষণমুক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে।
- পুকুর, হ্রদ, ডোবা, নদী, খাল-বিল বা সমুদ্র তীরবর্তী পানি ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এসব পানিতে কাদা, ধূলাবালি, ব্যকটেরিয়াসহ বিভিন্ন দূষণীয় উপকরণ থাকে। এসব পানি সরাসরি ব্যবহার করা হলে নতুন করে মাছ দূষিত হবে এবং তার পচন দ্রুততর হবে।
- বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে সমুদ্রের পানিও ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এর মান ভাল নয়। তাছাড়া এসব পানি দিয়ে বরফ বানাতে বেশি সময় লাগে এবং বিদ্যুৎ খরচও বেড়ে যায়।
- সবচেয়ে ভাল হয় টিউবওয়েল বা ডিপ টিউবওয়েলের পানি যথাযথ ভাবে পরিশুদ্ধ করে নিলে।
- বড় জলাধারে (tanks/reservoirs) বরফ বানানোর জন্য পানি জমিয়ে রাখলে সেসব জলাধার নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
- জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হলে বরফায়িত মাছের ভাল থাকার সময়কাল (shelflife) বৃদ্ধি পাবে। তবে এক্ষেত্রে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন মেনে ঔষধ নির্বাচন এবং তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

১. বরফ তৈরির জন্য পানির মান ভাল হওয়া জরুরী।

২. মৎস্য সংরক্ষণের জন্য কুচি বরফ (Flake ice) অধিক উপযোগী।

৩. যত শীঘ্র সম্ভব আহরিত মাছ পরিষ্কার করে (বিশেষ করে, নাড়িভুঁড়ি বা Gut অপসারণ করে) ভাল পানিতে ধুয়ে তারপর বরফ দিতে হবে। নাড়িভুঁড়ি অপসারণ করা হলে অবশিষ্ট মাছ অনেক বেশিদিন ভাল থাকবে। অপেক্ষাকৃত বড় মাছ হলে নাড়িভুঁড়ির পাশাপাশি মাথাও কেটে আলাদা করে নিলে মাছ ভাল থাকার স্থায়িত্ব কাল (Shelflife) আরও বৃদ্ধি পাবে। ছোট মাছে এ কাজগুলো একটু কষ্ট হলেও অপেক্ষাকৃত বড় মাছে এটি খুবই সম্ভব।

৪. মাছ রাখার পাত্রও (Styrofoam এর বা অন্য কিছুর) পরিষ্কার হতে হবে।

৫. ইনসুলেটেড বরফ বাক্স (Insulated ice box) লম্বা দূরত্বে পরিবহনের জন্য খুবই উপযোগী। অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বে বা স্থানীয় পরিবহনের জন্য ঢাকনিযুক্ত এ্যালুমিনিয়ামের হান্ডি বা হাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

- *সকল ধরনের পাত্রের তলায় বরফ-গলা পানি বের করে দেওয়ার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা থাকতে হবে।*
- *বাঁশের ঝুড়িতে মাছ পরিবহনের জন্য রাখতে হলে এর তলাসহ ভেতরের চতুপার্শ্ব পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন মাছ ঝুড়ির সরাসরি সংস্পর্শে না আসে। প্রতিবার ব্যবহারের পর এই পলিথিন সিটটি ভাল পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। শুধু পলিথিনের বদলে পলিথিন দিয়ে একদিক মোড়ানো পলিথিন বস্তা (Polythene gunny bag) আরও ভাল।*
- *মাছ ধোয়া পানি বা উচ্ছিষ্ট যেন পরিবেশের ক্ষতি না করে সেদিকে তিক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।*

৬. মাছ সংরক্ষণের জন্য মাছ ও বরফের অনুপাত হবে : শীতকালে ১:১ এবং গ্রীষ্মকালে ১:২। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১০ কেজি মাছের জন্য শীতকালে প্রয়োজন হবে ১০ কেজি বরফ, অন্যদিকে একই পরিমাণ মাছের জন্য গ্রীষ্মকালে প্রয়োজন হবে ২০ কেজি বরফ।

৭. পরিবহনকালে অথবা খুচরা/পাইকারী বিক্রির সময়, কোন সময়েই মাছ সরাসরি রোদের কিরণে অল্প সময়ের জন্য হলেও রাখা যাবে না।

মাছের রোগ, প্রতিকার ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

রোগ হচ্ছে যে কোন প্রাণীর দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা যা বিশেষ কিছু লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছ ও চিংড়ির মাঝেও নানা ধরনের রোগ বালাই হতে দেখা যায়। রোগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে প্রতি বছরই অনেক চাষির পুকুরে ব্যাপক আকারে মাছ ও চিংড়ি মারা যায়। চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দেশ লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হয়।

রোগের কারণ

জলজ পরিবেশের চাপ, রোগ-জীবাণু এবং মাছ ও চিংড়ির অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে জন্য মাছ ও চিংড়ি রোগাক্রা হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। এখন পর্যন্ত যে সব কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের অবনতি (পানির তাপমাত্রা, পচা জৈব পদার্থ, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি)
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ
- বাইরে থেকে ময়লা ধোয়া দূষিত পানির প্রবেশ
- অধিক মজুদ ঘনত্ব
- প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব
- ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন ও হ্যান্ডেলিং
- পরজীবী ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ

নিচের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ির রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা যায়-

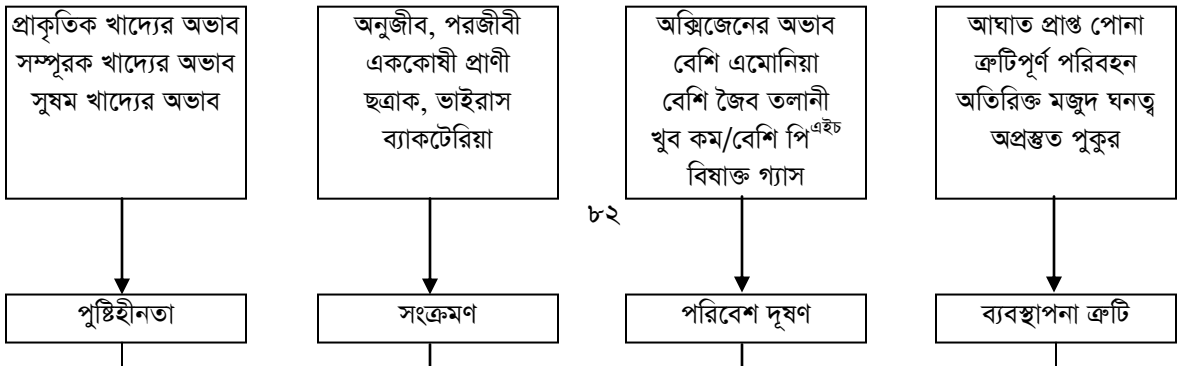

রোগের কারণ এবং মাছ ও চিংড়ির মড়কের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পানির পরিবেশ দূষিত হওয়ার ফলে পোনার মৃত্যহার অধিক হয় এবং পোনা দ্রুত মারা যায়। পোনার মড়কের অন্যান্য কারণ, যেমন- রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, পুষ্টির অভাব ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা অনেক বেশি।

রোগের সাধারণ লক্ষণ

রোগের প্রকারভেদ ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা পরজীবীর আক্রমণের ধরন অনুযায়ী রোগাক্রান্ত মাছ ও চিংড়ির মাঝে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে রোগাক্রান্ত মাছ ও চিংড়ির মধ্যে যে সমস্ত লক্ষণ ও আচরণ বেশি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

রোগাক্রান্ত মাছ

- ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ছন্দহীনভাবে পানির উপর সাঁতার কাটে
- শরীরের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে
- খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয় বা একেবারে বন্ধ করে দেয়
- পানির উপর ভেসে খাবি খায়
- ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়
- দেহের উপর লাল/কালো/ সাদা দাগ পড়ে
- দেহে বিজল থাকে না, দেহ খসখসে হয়ে যায়
- মাছ পানির তলদেশের কোন কিছুর সাথে গাঁ ঘষতে থাকে
- চোখ ফুলে যায় বা বাইরের দিকে বের হয়ে আসে।

রোগাক্রান্ত চিংড়ি

- ঠিকমত খাদ্য গ্রহণ করে না
- ধীর গতিতে চলাচল করে
- এলোমেলোভাবে পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকে
- পাড়ের কাছাকাছি ভেসে থাকে, কখনও পাড়ে উঠে আসে
- খোলস নরম হয়ে যায়
- ফুলকায় কালো দাগ দেখা যায়
- খোলসের উপর নীলাভ রং বা শেওলা জমে যায়
- হাঁটার অংগ এবং এণ্টিনা খসে পড়ে অথবা বাঁকা হয়ে যায়।

মাছ ও চিংড়ির সাধারণ রোগ

মাছ ও চিংড়ির রোগ চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। কারণ রোগ সনাক্তকরণ ও প্রতিটি মাছ বা চিংড়ির আলাদা আলাদাভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তারপরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে এগুলোর চিকিৎসা বা রোগের প্রতিকার করা জরুরী হয়ে পড়ে। নিচে মাছ ও চিংড়ির কিছু সাধারণ রোগ ও এগুলোর প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

মাছের সাধারণ রোগ

ক্ষত রোগ

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের অধিকাংশ মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণত শীত মৌসুমে এ রোগের সংক্রমণ বেশি হয়। এখন পর্যন্ত এ রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে দূষিত পরিবেশে ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে বলে ধারণা করা হয়।

লক্ষণ

- ত্বকে লাল দাগ ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়
- ক্ষতস্থানে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়।

প্রতিরোধ

শীতের শুরুতে ১ কেজি/প্রতি শতকে পুকুরে চুন প্রয়োগ এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখলে এ রোগ সাধারণত: হয় না

প্রতিকার

২-৪ পিপিএম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ১ মিনিট গোসল

১২৫ পিপিএম ফরমালিন দ্রবণে মাছকে গোসল করানো (যতক্ষণ সহ্য করতে পারে)।

লেজ ও পাখনা পচা রোগ

এ রোগ সাধারণতঃ অ্যারোমোনাস ও মিক্সো-ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। কার্পজাতীয় মাছে আক্রমণ বেশি হলেও মাঝে মাঝে পাংগাস মাছেও এ রোগ দেখা যায়। সাধারণত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- মাছের দেহ ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করে
- ত্বকের পিচ্ছিলতা কমে যায়
- প্রাথমিক পর্যায়ে লেজ ও পাখনায় লাল দাগ দেখা যায়
- পাখনার পর্দা ছিড়ে যায় এবং আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

প্রতিরোধ

পুকুরে ১ কেজি/প্রতিশতক হারে চুন প্রয়োগ।

প্রতিকার

- ২.৫% লবণ পানিতে ২-৩ মিনিট গোসল
- ২-৪ পিপিএম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ১ মিনিট গোসল।

ড্রপসি (পেটফুলা রোগ)

ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগের সংক্রমণ হয়ে থাকে। সরপুটি, গ্রাসকার্প, সিলভারকার্প ও শিং-মাগুরজাতীয় মাছে এ রোগ বেশি সংক্রমিত হতে দেখা যায়। সাধারণত শীতের প্রাক্কালে ও শীতকালে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- রোগাক্রান্ত মাছের পেট ও আঁইশের নিচে পানি জমে
- মাছের পেট ফুলে বেলুনের মত আকার ধারণ করে
- চামড়ায়ঘা হয় ও অন্ত্র ফুলে যায়
- আঁইশ আলগা হয়ে যায়।

প্রতিরোধ

- সুষম খাদ্য প্রয়োগ
- জৈব সার কম দেয়া
- প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ

প্রতিকার

- প্রতি কেজি খাবারে ২৫০ মি.গ্রাম রেনাভেট মিশিয়ে ৪-৭ দিন খাওয়ানো

আরগুলোসিস (মাছের উকুন)

সব ধরনের মাছে এ রোগ হতে পারে। সাধারণত মাছের পাখনা ও আঁইশের ফাঁকে আরগুলাস নামক এক প্রকার পরজীবী দ্বারা মাছ আক্রান্ত হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে আরগুলাসের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- মাছ অবিরাম ছুটাছুটি করতে থাকে
- মাছের গায়ে এ পরজীবী লেগে থাকতে দেখা যায় খালি চোখেই
- মাছ শক্ত জিনিসের সংগে গা ঘষতে থাকে
- দেহের বিভিন্ন স্থানে লাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়

প্রতিকার

- ১০ লি. পানিতে ২০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে ঐ দ্রবণে মাছকে গোসল করানো
- পুকুরে ৬-১২ গ্রাম/শতাংশ/ফুট হারে ডিপটেরেক্স পরপর ৩ সপ্তাহ প্রয়োগ অথবা
- সুমিথিয়ন ২-৩ মিলি/শতাংশ/ফুট হারে পরপর ৩ সপ্তাহ পুকুরে প্রয়োগ।

প্রতিরোধ

- প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ
- আক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত ভেজা জাল অন্য পুকুরে ব্যবহার না করা

ছত্রাক রোগ (সেপ্রোলেগনিয়াসিস)

এ রোগ সাধারণত রুইজাতীয় মাছের সকল প্রজাতি ও অন্যান্য চাষযোগ্য মাছে সংঘটিত হতে দেখা যায়। মাছের ডিম এবং রেণুর এটি একটি প্রধান রোগ। রোগ সংক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মাছের মড়ক দেখা দেয়। রোগটি সংক্রামক।

লক্ষণ

- মাছের দেহে বা ডিমে মিহি সুতার ন্যায় উজ্জ্বল বস্তু দেখা যায়।
- মাছের দেহে অতিরিক্ত পিচ্ছিল পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায়
- সংক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেলে মাছের ক্ষুধা হ্রাস পায়, মাছ ধীরে ধীরে ও অলসভাবে চলাফেরা করে, মাছের আক্রান্ত অংশে পচন ধরে, মাছে ব্যাপক হারে মড়ক দেখা দেয়।

প্রতিরোধ

- হ্যাচারির সকল যন্ত্রপাতি ও ট্যাংক সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করার পর শতকরা ১০ভাগ ফরমালিন পানি দিয়ে ধৌত করা
- অনিষিক্ত ও মৃত ডিমগুলোকে অবিলম্বে হ্যাচারি ট্যাংক থেকে সরিয়ে নেয়া এবং অধিক খাদ্য প্রয়োগ না করা।

প্রতিকার

- হ্যাচারিতে লালনকৃত ডিমগুলোকে ২৫০ পিপিএম ফরমালিন দিয়ে ধৌত করা
- ০.১০-০.১৫ পিপিএম মিথিলিন ব$_{2}$ দ্বারা আক্রান্ত পোনা বা ডিমগুলোকে ধৌত করালে বা দ্রবণে ১-২ ঘন্টা গোসল করালে প্রতিকার পাওয়া যায়

- ০.১৫-০.২০ পিপিএম হারে ম্যালাকাইট গ্রীন পুকুরে প্রতি সপ্তাহে একবার দু' থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায় ।
- ২.০-২.৫ শতাংশ লবণে আক্রান্ত মাছকে যতক্ষণ সহ্য করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত মাছকে গোসল করানো ।

পুষ্টির অভাবজনিত রোগ

পরিমিত খনিজ লবণ ও ভিটামিনের অভাবে মাছের দেহে বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই হতে দেখা যায় ।

লক্ষণ

- দেহ বেঁকে যায়
- লেজের অংশ বেঁকে যায়

প্রতিকার

- দেহ বা লেজ বেঁকে গেলে কোন প্রতিকারের উপায় নাই ।

প্রতিরোধ

- সুষম খাদ্য প্রয়োগ
- খনিজ লবণ ও ভিটামিন সম্বৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ ।

চিংড়ির রোগ

- এণ্টেনা ও সন্তরণ পদ খসে পড়া

কারণ

- ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ

লক্ষণ

- মজুদের ৩-৪ মাস পর এণ্টেনা, সন্তরণপদ খতি অথবা ঝরে পড়তে থাকে ।

প্রতিকার

- সাময়িকভাবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করা
- পানি পরিবর্তন করা
- পিএইচ পরীক্ষা করে ২৫০-৩০০ গ্রাম/শতাংশ হারে ডলোমাইট প্রয়োগ করা ।

খোলস শক্ত হয়ে যাওয়া

কারণ: পরিবেশগত পিএইচ, লবণাক্ততা বা তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে খোলস পাল্টায় না, শক্ত হয়ে যায় ।

লক্ষণ

- খোলস স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে শক্ত হওয়া
- বয়সের তুলনায় চিংড়ির কম দৈহিক বৃদ্ধি হওয়া ।

প্রতিকার

- পানির পরিবেশ উন্নয়ন
- পরিবেশের যে কোন হঠাৎ পরিবর্তন, যেমন- পানির উচ্চতা বৃদ্ধি অথবা রাসায়নিক সার প্রয়োগ

❑ ক্যারাপেস ও শরীরের উপর পাথর জমা

কারণ: পরিবেশগত যে কোন গুণাগুণ/বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। বিশেষ করে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এটি বেশি হতে দেখা যায় ।

*লক্ষণ:*করাত ও ক্যারাপেস অংশে ধূসর রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর দেখা যায় ।

প্রতিকার

- পুকুরের পানি পরিবর্তন
- স্বাদু পানির সরবরাহ বৃদ্ধি
- পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ।

❑ নরম খোলস বা স্পঞ্জের মত দেহ

চাষাবাদের মাঝামাঝি সময়ে প্রায়ই গলদা চিংড়ির মাঝে এ রোগ দেখা দেয় ।

কারণ

- পানিতে ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া
- এ্যামোনিয়া ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া
- পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব
- অনেকদিন পানি পরিবর্তন না করা ।

লক্ষণ

- খোলস নরম হয়ে যায়
- পা লম্বা ও লেজ ছোট হয়
- দেহ ফাঁপা হয়ে স্পঞ্জের মত হয় ।

প্রতিকার

- পুকুরে ২-৩ মাস অন্তর শতাংশ প্রতি ০.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ
- খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ।

❑ খোলস পাল্টানোর পর মৃত্যু

*কারণ:*খাদ্যে ভিটামিন বি-কমপে-ক্স, ফ্যাটি এসিড, প্রোটিন এবং খনিজ দ্রব্যের অভাব ।
লক্ষণ

- দেহ নরম থাকে এবং রং নীলাভ হয়ে যায়
- মৃত চিংড়ি রান্না করলে রং হালকা কমলা বর্ণ ধারণ করে । উল্লেখ্য যে সুস্থ চিংড়ি রান্না করলে রং লাল হয় ।

প্রতিকার: প্রতি কেজি খাদ্যের সংগে ৫০ মিলি হারে ভিটামিন প্রি-মিক্স (এমবাভিট-জি) প্রয়োগ ।

❑ গায়ে শেওলা পড়া

*কারণ:*খোলস পরিবর্তন না করা ও চিংড়ির চলাফেরার গতি কমে যাওয়া ।
*লক্ষণ:*চিংড়ি ধরার পর সারা দেহে সবুজ অ্যালজি দেখা যায় ।
*প্রতিকার:*পানি বাড়িয়ে দিতে হবে এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে ।

মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ

আমাদের দেশে চাষির আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা ও চিকিৎসা পদ্ধতির জটিলতার কারণে মাছ ও চিংড়ির রোগ-চিকিৎসা চাষিদের পক্ষে শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, অনেকটা অসম্ভবও বটে । এ কারণে মাছের রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধই অধিক শ্রেয় । চাষের শুরুতেই নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে মাছ ও চিংড়ির রোগ চিকিৎসার মতো বিরক্তিকর বিষয় পরিহার করা যেতে পারে -

- পুকুরে পরিমিত সূর্যালোকের ব্যবস্থা করা

- পুকুর শুকিয়ে নিয়মিত চুন দেয়া
- কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত চারাপোনা বা জুভেনাইল মজুদ না করা
- বাইরের অবাঞ্চিত প্রাণি ও পানি পুকুরে ঢুকতে না দেয়া
- তলায় অতিরিক্ত কাদা না রাখা
- পরিমিত সার ও খাদ্য সরবরাহ করা
- পুকুরে ঘন ঘন জাল না ফেলা
- পুকুরে ঘোলাত্ব সুষ্টির উৎস বন্ধ করা ।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর অধিক এবং লাভজনক উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল । ভাল ব্যবস্থাপনার পরও চাষকালীন সময়ে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে ফলে উৎপাদন ব্যাপক হ্রাস ঘটার আশংকা থাকে । নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে এরূপ কিছু ঝুঁকি সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো:

১. রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছের প্রবেশ

পুকুর শুকানো অথবা রোটেনন প্রয়োগ করার পরও অনেক সময় পুকুরে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ থেকে যেতে পারে । এ ছাড়াও বর্ষাকালে পানির সাথে বা অন্য কোন ভাবে যে কোন সময় বাইরে থেকে শোল, টাকি, কৈ, শিং, মাগুর, চান্দা, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে পারে । এতে ব্যাপকভাবে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন কমে যেতে পারে ।

প্রতিকার

পাখি, জাল, বৃষ্টির পানি বাইরে থেকে আসা স্রোত বা মানুষের মাধ্যমে রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ প্রবেশ করে । তাই এ সমস্ত উৎস থেকে সতর্ক থাকতে হবে । নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উল্লেখিত সমস্যার প্রতিকার করা যেতে পারে-

- পুকুরে বাইরের পানি ঢুকতে না দেয়া
- জাল ব্যবহারের সময় সর্তকতা অবলম্বন
- বাচ্চাদের নজরে রাখা
- প্রয়োজনে পুকুরের চারদিকে ৩০ - ৪০ সেমি উঁচু বানা বা মশারি জালের বেড়া দেয়া ।

১. পানির উপর ঘন সবুজস্তর

অতিরিক্ত শেওলার জন্য পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যায় । ফলে রাতের বেলায় পানিতে অক্সিজেন কমে যায় এবং দিনের বেলায় পিএইচ মান বেড়ে যায় । এ ছাড়া শেওলা মরার পর পুকুরের তলায় জমা হয় এবং পচে গিয়ে পানি দূষণ ও বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে । এ অবস্থায় অতিরিক্ত অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে মাছ ও চিংড়ি পানির উপরি তলে খাবি খায় এবং কখনও কখনও ব্যাপকহারে মারা যায় ।

প্রতিকার

তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে পুকুরে অগভীর নলকূপের পরিষ্কার ঠান্ডা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয় । সেই সাথে পুকুরে খাদ্য ও সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে । এছাড়াও কিছু সিলভার কার্পের চারা পোনা ছেড়ে জৈবিকভাবে অতিরিক্ত উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ।

৩. পানির উপর লাল সর

অতিরিক্ত লৌহ অথবা লাল শেওলার জন্যে পানির উপর লাল স্তর পড়তে পারে । ফলে সূর্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে পারে না । এ জন্যে পুকুরে খাদ্য ও অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয় ।

প্রতিকার

ধানের খড় বা কলাপাতা পেচিয়ে দড়ি বানিয়ে পানির উপর টেনে তুলে ফেলা যায় ।

৪. এমোনিয়া জমা হওয়া

বিভিন্ন কারণে পুকুরের তলদেশে এমোনিয়া সৃষ্টি হতে পারে । উচ্চতর পিএইচএ এমোনিয়া চিংড়ির জন্য অত্যন্ত মারাত্নক । পুকুরে ফাইটোপ-প্লাংকটন বেড়ে গেলে পানির পিএইচ দ্রুত বাড়তে থাকে । ফলে ব্যাপক সংখ্যায় মাছ ও চিংড়ি মারা যায় ।

চিংড়ির ফুলকায় কালো দাগ পড়লে বুঝতে হবে নাইট্রোজেন বর্জ্য ও অন্যান্য রাসায়নিকের মাত্রা বেশি। এমোনিয়া বেড়ে গেলে রক্ত পরিবহনতন্ত্র দ্রুত আক্রান্ত হয়।

প্রতিকার

মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখা, সম্ভব হলে ৩০-৫০% পানি বদল ও পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ। প্রাথমিক অবস্থায় ৬০% শক্তির ব্লিচিং পাউডার ০.৫ পি পি এম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

৫. খাবি খাওয়া

অনেক পুকুরেই আগষ্ট-সেপ্টেম্বর এবং এপ্রিল-মে মাসে এ সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দেয়। সাধারণত ভোর রাতের দিকে মাছ ও চিংড়ি পানির উপর ভেসে উঠে খাবি খেতে থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণে এটা ঘটে। অক্সিজেন স্বল্পতা যদি খুব বেশি ও দীর্ঘ মেয়াদী হয়, তবে মাছ ও চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

প্রতিকার

প্রাথমিক অবস্থায় সাময়িকভাবে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।এর সাথে সাথে বাঁশ পিটিয়ে বা সাঁতার কেটে অথবা এলুমিনিয়ামের ডেকচি দিয়ে পানিতে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়াতে হবে। বিপদজনক অবস্থায় পুকুরে পরিষ্কার নতুন পানি সরবরাহ বা স্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে একই পুকুরের পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে দীর্ঘসময়ব্যাপী পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা চলতে থাকলে বড় মাছ ও চিংড়ি ধরে বিক্রি করা যেতে পারে।

৬. রাক্ষুসে প্রাণীর উপদ্রব

সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও উদ খেয়ে ফেলে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে।

প্রতিকার

সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও উদ দেখার সাথে সাথেই মেরে ফেলতে হবে। এ সমস্ত প্রাণি নিয়ন্ত্রণে কায়িক মাধ্যমই সবচেয়ে ভাল। উদ নিয়ন্ত্রণে চুন ভর্তি ডিমের খোসা পুকুরের পাড়ে রেখে দিলে উদের উৎপাত কমে যায়। বাঁশের চাঁই ব্যবহার করে সহজেই কাঁকড়া মারা যায়। সাধারণভাবে ব্যাঙ যে সব জায়গায় ডিম দেয় (যেমন- পানি ও পাড়ের সংযোগ স্থল) সেসব স্থলের ঘাস দূর করে ফেলতে হবে। এছাড়াও যে সমস্ত পুকুরের আশেপাশে জঙ্গল থাকে সেখানেই এসব প্রাণির উপদ্রব বেশি হয়। এ জন্য পুকুরের চারপাশ আগাছা-জঙ্গল মুক্ত রাখতে হবে।

৭. অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ সমস্যা। প্রায় সব চাষিই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ করে। ফলে এ সব খাদ্যের একটা বড় অংশ তলায় জমা হয়ে পানির পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে। এতে মাছ ও চিংড়ি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

প্রতিকার

প্রয়োগের পূর্বে খাদ্যের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। মাঝে মাঝে খাদ্য প্রয়োগ স্থানের মাটিতে জমে থাকা পচা জৈব পদার্থ অপসারণ করতে হবে।

৮. ঘোলাত্ব

বৃষ্টি ধোয়া পানিতে পুকুর ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। এর ফলে সূর্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে পারে না এবং প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি বাধাগ্রস্ত হয়। এ ছাড়াও মাছের ফুলকা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রতিকার

বৃষ্টি ধোয়া পানির প্রবেশ রোধ করার জন্য সমতল ভূমি থেকে পুকুরের পাড় উঁচু রাখতে হবে। ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি করে পোড়া চুন বা জিপসাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। খসখসে পাতাবিশিষ্ট (খোকসা, শেওড়া, বাঁশ) গাছের ডাল, ধানের খড় এক সপ্তাহ ডুবিয়ে রাখলেও ঘোলাত্ব নিবারণ হতে পারে।

৯. তলার কালো কাদা

অতিরিক্ত খাদ্য ও জৈব পদার্থ পুকুরের তলায় জমা হয়ে তলার মাটি কালো দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে চাষ করা পুকুরে এ সমস্যা প্রকট। এর ফলে বিষাক্ত গ্যাস তলায় জমা হয়ে রুই জাতীয় মাছ, থাই পাঙ্গাশ চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়াও চিংড়ির দেহ কালো হয়ে বাজার মূল্য হ্রাস করে।

প্রতিকার

চিংড়ি ছাড়ার পূর্বে তলার অতিরিক্ত কালো কাদা তুলে ফেলতে হবে। চাষকালীন সময়ে চিংড়ির মাকড় দেখা দিলে দ্রুত পানি বদল, মজুদ ঘনত্ব হ্রাস এবং সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

১০. স্বজাতিভোজিতা

চিংড়ি চাষের এটি একটি বড় সমস্যা। স্বভাবগত কারণে চিংড়ি স্বজাতিভুক প্রাণী। যখন এদের খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন এরা ছোট ও দুর্বল আকৃতির চিংড়িগুলোকে ধরে খায়।

প্রতিকার

মজুদকালীন সময়ে পুকুরে একই আকৃতির পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। এ ছাড়াও নিয়মিত সার ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে পুকুরে খাদ্যের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. বৃষ্টির পর ভেসে উঠা

বৃষ্টির পর অনেক সময় মাছ ও চিংড়ি পানির উপর ভেসে খাবি খেতে পারে। পানির পিএইচ কমে যাওয়ার ফলে ও ক্ষতিকর হাইড্রোজেন সালফাইডের বিষক্রিয়া বেড়ে যাওয়ায় এটা ঘটে থাকে।

প্রতিকার

বৃষ্টির পরপরই পানির পিএইচ পরিমাপ করতে হবে। প্রতিবার ভারী বৃষ্টির পর প্রতি শতকে ৭৫-৮০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

১২. অমাবশ্যা/পূর্ণিমায় চিংড়ির পাড়ে চলে আসা

অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার তিথিতে রাতের বেলায় চিংড়ি পাড়ের উপর চলে আসতে পারে। ফলে শিয়াল বা অন্য কোন নিশাচর রাক্ষুসে প্রাণী দ্বারা চিংড়ি আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকার

অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার সময় অতিরিক্ত সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা। তবে পুকুরের পানির পরিবেশ ভাল থাকলে এ অবস্থা দেখা যায় না।

১৩. খরা

অনাবৃষ্টিজনিত সমস্যায় পুকুরের পানি কমে/গরম হয়ে পুকুরের অক্সিজেন স্বল্পতা সহ মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

প্রতিকার

গভীর/অগভীর নলকূপ থেকে ভূগর্ভস্থ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। পুকুরের পানির এক তৃতীয়াংশ কচুরিপানার আচ্ছাদন তৈরী করে পানি ঠান্ডারাখার ব্যবস্থা করা অন্যথায় ঝুঁকি এড়াতে বড় আকারের মাছ আহরণ ও বাজারজাত করাই শ্রেয়।

১৪. বন্যা

যৌক্তিক কারণেই সকল স্তরের জলাশয়ে মাছচাষ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই জলাশয়গুলোর উপযুক্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াই চাষ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে বর্ষাকালে বন্যা বা অতি বর্ষণজনিত কারণে অনেক জলাশয় প্লাবিত হওয়ায় মাছচাষিরা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন।

প্রতিকার

- পুকুর বা চাষের জলাশয়প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বন্যার অব্যবহিত পূর্বেই জলাশয়ের চারপাশে জাল/বানা দিয়ে মাছ বের হয়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা
- বন্যার পূর্বেই মাছ আহরণ করা
- বন্যার পরপরই প্লাবিত পুকুর প্রস্তুত করে বড় আকারের পোনা মজুদ করা।

১৫. বিষ প্রয়োগ

পুকুরে শত্রুতামূলকভাবে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের ক্ষতিসাধন বর্তমানে একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে ।

প্রতিকার

- বিষ প্রয়োগের পরপরই পুকুরে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করানো এবং অতি দ্রুতজীবিত মাছ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করা
- বিষক্রিয়ায় মৃত মাছ পুড়িয়ে ফেলা বা মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখা
- গোলযোগপূর্ণ জলাশয়ে মাছচাষে নিরুৎসাহিত করা
- সামাজিকভাবে সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
- বাণিজ্যিক খামারে পাহারার ব্যবস্থা করা
- বাড়তি সতর্কতা হিসেবে বড়মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ ।

১৬. মাছ চুরি

বিষ প্রয়োগের ন্যায় মাছ চুরিও অপর একটি সামাজিক সমস্যা- যা নিরসনে চাষিকে স্থানীয় অবস্থাভেদে ব্যবস্থা নিতে হবে ।

প্রতিকার

- পুকুর পাহারার ব্যবস্থা রাখা
- পুকুরে বাঁশের কঞ্চি পুঁতে রেখে জাল টানায় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা
- বিক্রয়যোগ্য বড়মাছ দ্রুত আহরণ ও বাজারজাত করা
- সামাজিকভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করা ।

১৭. পানি দূষণ

নিম্নোক্ত বিশেষ বিশেষ কারণে পুকুর/জলাশয়ের পানি দূষিত হয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস সহ মৃত্যুর মাধ্যমে ক্ষতি সাধিত হয় ।

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য
- শহর/আবাসিক এলাকার পয়ঃ নিঃসরণ
- কৃষি জমির কীটনাশক/রাসায়নিক উপাদান নিঃসরণ
- অতিরিক্ত জৈব সার ও খাদ্যোপাদান পুকুরের তলায় জমা হওয়া
- হঠাৎ করে মাত্রাতিরিক্ত পশুর রক্ত ও নাড়ি-ভুঁড়ির বর্জ্য পুকুরে প্রয়োগ
- গৃহস্থ বাড়ির আঙিনা থেকে জৈব পদার্থ (গোবর/কম্পোস্ট/মলমূত্র) ইত্যাদি বৃষ্টির পানিতে চুঁয়ে পুকুরে পতিত হওয়া ।

প্রতিকার

- দূষিত পানি দ্রুত পরিবর্তন ও বিশুদ্ধ পানি পুকুরে দেয়া
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য যেন পুকুরে পড়তে না পারে তার ব্যবস্থা নেয়া
- পুকুরের পাড় উঁচু করা
- অবস্থাভেদে প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন এবং পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করা
- অতি দ্রুততার সঙ্গে দূষণ উপাদান অপসারণ করা ।

১৮. হাস-মুরগির মল/লিটার ব্যবহার

পুকুরে হাস-মুরগির/লিটার প্রয়োজনের ফলে রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে ।
তাই এই সমস্যার সমাধান হাস-মুরগির মল/লিটার/ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে ।

প্রতিকার হাস-মুরগির মল/লিটার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ।